মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি. নং- ১৪৫ বর্ষ-৩, সংখ্যা-০৭

الأبرار
مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

আগস্ট ২০১৪ইং, শাওয়াল ১৪৩৫হি:,শ্রাবণ ১৪২১বাং
شوال ١٤٣٥ اغسطس ٢٠١٤م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ইমেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৪
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৫
মাওয়ায়েযে ফক্বীহুল মিল্লাত :
বিপদ-আপদ : কারণ ও প্রতিকার ৬
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
হাদীস ও সুন্নাহ : বিভ্রান্তি ও নিরসন..... ১০
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
সদকায়ে ফিতর ও ঈদ
তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল..... ১২
মুফতী শাহেদ রহমানী
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৭..... ১৬
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
সারা বিশ্বে একই দিনে রমাজানের রোযা আরম্ভ
ও ঈদ উদ্‌যাপন : একটি পর্যালোচনা..... ২০
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
তাবলীগি কাজের সূচনা-৪..... ২৬
মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী
লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৪.... ৩২
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব ফয়জাবাদী কাসেমী
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৩ ..... ৩৭
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৩
ইসলামে মানবাধিকার ৫..... ৪৬
মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

রমাযান পরবর্তী মুসলমানদের করণীয়

হিজরী বর্ষের প্রতি এগারো মাস পর রমাযান আসে। রমাযান ইবাদতের মাস। এগারো মাস যাবৎ মুসলমানগণ বিভিন্ন জানা-অজানা পাপপঙ্কিলতার মাঝে অতিবাহিত হওয়ার পর রমাযান মাসে যথাসাধ্য ইবাদত-বন্দেগী করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে সমর্থ হয়। এরপর আসে শাওয়াল মাস। বলতে গেলে শাওয়াল মাস থেকে পুনরায় মুসলিম উম্মাহের যাবতীয় কাজকর্ম আরম্ভ হয় নবোদ্যমে। রিয়াযাত-মুজাহাদা ও অহর্নিশ ইবাদত-বন্দেগীতে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে রমাযান মাসকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রকার গোনাহ ও পাপপঙ্কিলতা মুক্ত হয়ে মুসলমানগণ নতুন কর্মজীবন আরম্ভ করে শাওয়াল মাস থেকে।

কাজের এই সূচনালগ্নে মুসলমানদের অনেক বিষয় চিন্তা করার রয়েছে। স্বচ্ছ ও সুন্দর একটি পরিকল্পনার বিষয় আছে। আগামী এগারো মাস যদি আল্লাহ তা'আলা বাঁচিয়ে রাখেন তবে কিভাবে এই সময়গুলো কাটাতে হবে, কিভাবে কর্মজীবনকে সুন্দর ও সাচ্ছন্দ্যময় করা যাবে, কী কী বিষয়ের সম্মুখীন হতে হবে? কী কী বিষয় ছাড়তে হবে? কী কী বিষয় গ্রহণ করতে হবে–এসবের একটি বিশাল ফিরিস্তি তৈরি করে তার পরই কর্মজীবনের মহাসমুদ্রে সুচিন্তিত কদম রাখা অত্যাবশ্যক।

একজন মুসলমান মানুষ হিসেবে সেও বিশ্ব পরিবারের একজন সদস্য। আবার মুসলমান হিসেবে পুরো মুসলিম জগতের একটি অংশ। সুতরাং যেকোনো পদক্ষেপ সর্বপ্রথম তাকে মানুষ হিসেবে দ্বিতীয়ত মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শের মূর্তপ্রতীক হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ব চরাচরে যখন মুসলমান এবং ইসলামী দেশগুলো চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের শিকার তখন একজন মুসলমানকে অবশ্যই তার যাবতীয় বিষয় এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে এর কোনো একটি অংশে ষড়যন্ত্রের কালিমা স্পর্শ করতে না পারে। এই কারণে বর্তমান সময়ের মুসলিম উম্মাহকে তাদের কর্মজীবনের প্রারম্ভে হিসাব-নিকাশ আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়া আবশ্যক।

প্রথমে নজরে থাকতে হবে, একজন মুসলমানকে জীবন চলার পথে কয়টি স্তরের সাথে আলিঙ্গন করতে হবে। উক্ত স্তরসমূহে কোনটি তার জন্য আবশ্যক আর কোনটি তার জন্য বাহ্যিক বিষয়। আবশ্যক বিষয়গুলোকে তার কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, বাহ্যিক বিষয়গুলোর প্রতি ধাবিত হওয়া তার জন্য কতটুকু জরুরি। এটি শুধু সাধারণ জনগণের জন্য নয় বরং সরকারে থাকা দেশের কর্ণধার ব্যক্তিবর্গেরও চিন্তা করা উচিত, একটি রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনা, রাষ্ট্রের সার্বিক স্বার্থ রক্ষা, গণমানুষের উন্নয়ন ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য জনগণের কোন বিষয়কে কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া অত্যাবশ্যক।

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শান্তিশৃঙ্খলা, মানুষের নিরাপত্তা। চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র আর জোর-জুলমের কারণে মুসলিম দুনিয়া জর্জরিত। কোনো দেশই আজ এই ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ নয়। তবে ষড়যন্ত্র আর জোর-জুলুমের ধরন ভিন্ন হতে পারে।

মুসলিম দুনিয়ার এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণ যে কারো একার পদক্ষেপ একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। বা যে কারো একার দায়িত্বও নয়। বরং প্রত্যেকটি মুসলমানের এবং মুসলিম দেশে বাস করা অন্যান্যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল জনগণেরই দায়িত্ব।

স্বয়ং আমাদের বাংলাদেশের কথাই বলি, এটি বিশ্ব দরবারে মুসলমানদের দেশ বলেই পরিচিত এবং স্বীকৃত। এ দেশ জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্রও বটে। তাহলে অমুসলিম এবং ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রের টার্গেট হবে এ দেশ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্টবিষয়ক অনেক ষড়যন্ত্রের তোপও এ দেশের দিকে। বোঝা যায়, বর্তমানে বহুগুণে শান্তিময় এই বাংলাদেশও অন্যদের টার্গেটমুক্ত নয়।

এসব থেকে উত্তোরণ সম্ভব সকল গণমানুষের একক চিন্তা-চেতনায়। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায়। তাই আজকে শাওয়ালের শুরুতে আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ যেন আমাদের দ্বারা সংঘটিত না হয়। এমন কাজই যেন আমার দ্বারা সম্পাদিত হয়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সুবাতাস বইতে থাকে।

এ ব্যাপারে আরো ব্যাপক দায়িত্ব থাকে দেশের উলামায়ে কেরামের। কারণ তাঁরা মুসলমানদের মূল অভিভাবক। তাঁদের প্রচেষ্টায় ইসলামের আদর্শ চর্চিত হয়, মুসলমানগণ তাঁদের কাছ থেকে ধর্মীয়ভাবে সঠিক ও সুস্থ চিন্তা-চেতনার প্রশিক্ষণ নেয়। সঠিক ইলম ও আদর্শ শেখে। তাই স্বয়ং আলেম উলামাকেও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে সামনের দিনগুলোতে তাঁরা কি পদ্ধতি গ্রহণ করবেন। যে কোনো সমস্যার মোকাবেলা কিভাবে করা যাবে। আগন্তুক সমস্যাগুলোর সমাধানে ইসলাম কি বলে? এসব বিষয়ে নিজেদের ঘরাণায় পরামর্শ করে ঐব্যবদ্ধ পদক্ষেপ নেওয়াই উচিৎ।

মুসলমানরা যারযার মত করে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে গেলে তাতে সমাধান হবে না, বরং সমস্যা বাড়বে, আরো বাড়বে।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুত যারা তোমাদের ওপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের ওপর জবরদস্তি করো, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের ওপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, যারা পরহেযগার আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছে। আর ব্যয় করো আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালোবাসেন। (বাকারা ১৯৪-১৯৫)

সপ্তম হিজরীতে যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিগত বছরের ওমরাহর কাযা আদায় করার নিয়তে সাহাবীগণ (রা.)সহ মক্কা অভিমুখে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ জানতেন যে, সেসব কাফিরের কাছে চুক্তি ও সন্ধির কোনোই মর্যাদা নেই। এমনও হতে পারে, তারা সন্ধির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মনে এই আশংকার উদ্ভব হয় যে, এতে করে হারম শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। সাহাবায়ে কেরামের এই আশংকার জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হারম শরীফের সম্মান প্রদর্শন করা মুসলমানদের অবশ্যই অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু যদি কাফিররা হারম শরীফের এলাকায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তবে তার মোকাবিলায় মুসলমানদের পক্ষেও যুদ্ধ করা জাযেয।

সাহাবীগণের মনে দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই, এটা যিলকদ মাস এবং সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত। যেগুলোকে আশহুরে হুরুম বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এই মাসসমূহে কোথাও কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে তবে আমরা এই মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করব। তাদের এই দ্বিধা দূর করার জন্যই আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার হারম শরীফের সম্মানার্থে শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরীয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসে (সম্মানিত মাসেও) যদি কাফিররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েয।

মাসআলা : আশহুরে হুরুম বা সম্মানিত মাস চারটি। ১। যিলকদ। ২। যিলহজ্ব ৩। মহররম ও ৪। রজব। তন্মধ্যে যিলকদ, যিলহজ্ব ও মহররম আনুক্রমিক ও পরস্পরসংলগ্ন মাস। রজব মাস বিচ্ছিন্ন একটি আলাদা মাস। ইসলামপূর্ব যুগে এ চার মাসে যুদ্ধবিগ্রহকে হারাম মনে করা হতো। মক্কার মুশরিকরাও এ বিধি মেনে চলত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে হিজরী সপ্তম সন পর্যন্ত এ রীতিনীতিই বলবৎ ছিল। সেজন্যই সাহাবায়ে কেরামের মনে এই সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়ার এই নির্দেশ মনসূখ (বাতিল) করে উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত ইজমা মতে যুদ্ধের সাধারণ অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু এখনও এ চার মাসে প্রথমে আক্রমণ না করাই উত্তম। এই মাসগুলোতে কেবলমাত্র শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করা উচিত। এ হিসেবে এ কথা বলা একান্তই যথার্থ যে, এ চার মাসের সম্মান এখনও পূর্বের মতোই বলবৎ রয়েছে। মক্কার হারম শরীফে প্রয়োজনবোধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়ায় তার সম্মান ব্যাহত হয়নি। বরং এতে একটা ব্যতিক্রমী অবস্থার ওপর আমল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে মাত্র।

জিহাদে অর্থ ব্যয় : وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ এবং তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করো। এই আয়াতে স্বীয় অর্থসম্পদ থেকে প্রয়োজনমতো ব্যয় করা মুসলমানদের প্রতি ফরয হয়েছে। এই আয়াত থেকে ফিকহ শাস্ত্রবিদ আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলমানদের ওপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমন কিছু দায়দায়িত্ব ও খরচের খাত রয়েছে, যেগুলো ফরয। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোনো খাত নয় বা সেগুলোর জন্য কোনো নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই। বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন, তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। আর যদি প্রয়োজন না হয় তবে কিছুই খরচ করা ফরয নয়। জিহাদে অর্থ ব্যয় এই পর্যায়ভুক্ত।

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

শাওয়ালের ছয় রোযার ফযীলত

عن ابى ايوب الانصارى انه حدثه ان رسول الله ﷺ قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر- (مسلم ٢/٨٢٢ رقم الحديث ١١٦٤)

"হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমাজান মাসের রোযা রাখল, অতঃপর শাওয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখল তাহলে সে ব্যক্তির রোযা এক যুগ তথা এক বছর সমপরিমাণ হবে।" (মুসলিম ২/২২৮ হাদীস নং ১১৬৪)

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, উলামায়ে কেরাম বলেছেন, صيام الدهر (এক যুগ সমপরিমাণ রোযা) এটা এজন্য যে, এক নেকীর বিনিময় হয় দশ গুণ। তাই রমাজানের এক মাসের রোযার বিনিময়ে দশ মাসের সওয়াব হবে। আর শাওয়াল মাসের ৬ দিনের বিনিময়ে দুই মাসের সওয়াব হবে। মোট ১২ মাস তথা এক বছরের সওয়াব হবে।

عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ يقول جعل الله الحسنة بعشر امثالها فشهر بعشر اشهر وصيام ستة ايام بعد الفطر تمام السنة (السنن الكبرى للنسائى ٢/١٦٣ رقم الحديث ٢٨٦١)

হযরত ছাওবান (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি নেকীকে দশ গুণ বৃদ্ধি করেন। সুতরাং রমাজানের এক মাস রোযা রাখার দ্বারা দশ মাস রোযা রাখার সওয়াব হবে এবং ঈদুল ফিতরের পরে ছয়টি রোযা রাখার দ্বারা পূর্ণ এক বছর রোযা রাখার সওয়াব হবে। (ইমাম নাসায়ী ফীস সুনানিল কুবরা ২/১৬৩ হাদীস নং ২৮৬১)

سمعت جابر بن عبد الله الانصارى يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول : من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها- (مسند الامام احمد ٣/٣٠٨ رقم الحديث ١٤٣١٢)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমাজানের রোযা এবং শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখল সে যেন পূর্ণ এক বছরই রোযা রাখল। (মুসনাদে আহমদ ৩/৩০৮ হাদীস নং ১৪৩১২)

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من صام رمضان واتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (المعجم الاوسط ٨/٣٢٨ رقم الحديث ٨٦٢٢)

হযরত ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমাজান মাসের রোযা রাখল, অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখল সে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় গোনাহমুক্ত হয়ে গেল। (আল মু'জামুল আওসাত ৮/৩২৮ হাদীস নং ৮৬২২)

عن ثوبان عن رسول الله ﷺ قال: من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة (موارد الظمأن الى زوائد ابن حبان رقم الحديث ٩٢٨)

হযরত ছওবান (রা.)সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি রমাজান মাসের রোযা ও শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখল, সে যেন পুরো বছরই রোযা রাখল। (মাওয়ারিদুয যামআন হাদীস নং ৯২৮)

عن ابى ايوب صاحب النبى ﷺ عن النبى ﷺ قال: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر (ابو داود ٢/٨١٣ رقم الحديث ٢٤٣٣)

আবু আইয়ূব (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি রমাজানের রোযা রাখল, অতঃপর শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখল সে যেন এক যুগ (পূর্ণ বছর) রোযা রাখল। (আবু দাউদ ২/৮১৩ হাদীস নং ২৪৩৩)

হাদীসে বর্ণিত শাওয়াল মাসের ছয় রোযার ফযীলত অর্জনে মুরব্বিগণ ছয় রোযার খুব গুরুত্ব দিতেন। এখনো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ছয় রোযার গুরুত্ব বিদ্যমান, যদিও তা তুলনামূলক খুব কম। অথচ হাদীসে বর্ণিত ফযীলত হিসেবে এর গুরুত্ব আরো বেশি দেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন মাদরাসা ও মাদরাসা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে অবশ্য এর গুরুত্ব এখনও অটুট আছে। মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরায় শাওয়াল মাসে ছাত্রদের ভর্তির কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পরই সকল উস্তাদ ও ছাত্র সম্মিলিতভাবে ছয় রোযা রাখেন। রমাজানের ন্যায় সকল উস্তাদ ও ছাত্রদের জন্য এক সাথে ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়। এতে ছয় রোযার সময়ও এক অনন্য মোবারক পরিবেশ এখানে লক্ষ করা যায়। বলতে গেলে, মারকাযে ছয় রোযার মাধ্যমে লেখাপড়া আরম্ভ হয় এবং বছরের শেষে শবেবরাতের রোযার মাধ্যমে শিক্ষাবর্ষের নিয়মিত দরস সমাপ্ত হয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে হাদীসে বর্ণিত সওয়াব অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

হেদায়াত :

দ্বীনি কিতাবসমূহ বা ওয়াযের ব্যবস্থাপনা কোনো মুহাক্কিক আলেমের মাধ্যমে করবে। নিজে নিজে কখনো করবে না। ওয়ায়েয পাওয়া না গেলে হযরত হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর সহজকৃত ওয়াযসমূহ অধ্যয়ন করবে এবং শোনাবে। ইনশাআল্লাহু তা'আলা অনেক উপকার হবে। এমনিভাবে হযরতের মালফূযাত নিজেও অধ্যয়ন করবে এবং অন্যদেরকেও করতে দেবে।

☆ নিজ মুতাআল্লিকীন বা অধীনস্তদের মধ্যে শরীয়তবিরোধী কোনো হালত দৃষ্টিগোচর হলে তার সংশোধনের চেষ্টা ও ইহতিমাম করবে। আর তার অবস্থাসমূহ কোনো মুসলিহকে জানিয়ে সংশোধন পদ্ধতি জেনে তদানুযায়ী আমল করবে।

☆ যে সমস্ত মা'মূলাত অভ্যাস কিংবা ইবাদত হিসেবে জারি আছে, সেগুলোর ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের নিকট তাহকীক করবে অথবা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ হতে সে ব্যাপারে সমর্থন হাসিল করবে। কেননা অনেক জিনিস ভুল ও প্রথা হিসেবে প্রচলিত হয়ে থাকে। যদ্দরূন অন্যান্য অনেকেই তাতে জড়িয়ে পড়ে।

ভুল ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে আপনি আগলাতুল আওয়াম গ্রন্থ হতে মোটামুটি ইলম অর্জন করতে পারবেন। এর পাশাপাশি কসদুসসাবীল এর শেষে তাযঈল নামে যে পুস্তিকাটি আছে, সেটাও অধ্যয়ন করতে থাকবেন। আর হায়াতুল মুসলিমীনের গুনাহ অধ্যায় দেখতে থাকাও দারুণ উপকারী হবে। এর দ্বারা সংশোধনযোগ্য অনেক অবস্থা ও ব্যাপার সামনে আসবে।

☆ যেসব হালত, ব্যাপার বা সুরত সামনে আসে, কিন্তু সেগুলোর বিধান জানা নেই, চাই সেগুলোর সম্পর্ক ব্যবসা ও কৃষিকাজের সাথে হোক, চাই বিবাহ ও তালাকের সাথে, চাই নামায ও রোযার সাথে, চাই পানাহারের সাথে হোক অথবা মেলামেশার সাথে। এসব ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কাছে জিজ্ঞেস করে আমল করবেন। যার সহজ পন্থা হলো এসব বিষয়কে প্রশ্নের আকারে লিখে কোনো মুফতী সাহেবের খিদমতে পাঠিয়ে দেবেন। আর উত্তর প্রাপ্ত হওয়ার পর তা সংরক্ষণ করে রাখবেন। এভাবে অনেক বড় জ্ঞানের ভাণ্ডার জমা হতে পারে।

দিলের হিম্মত ও কলবের সৎ সাহসের জন্য কয়েকটি বিষয় বলা হচ্ছে, সেগুলো অবলম্বন করবেন।

☆ বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার যিকির করবেন। এর জন্য সংখ্যা বা সময়ের কোনো শর্ত নেই। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, যেভাবে যত বেশি সম্ভব যিকির করবেন। দরূদ শরীফ, কালিমায়ে তায়্যিবা, সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার অথবা শুধু আল্লাহ আল্লাহ মনে যেটা চায় পড়বেন আর এই নিয়্যত রাখবেন যেন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে উন্নতি সাধন হয়।

☆ কোনো বিশেষ সময়ে, উদাহরণস্বরূপ, ফজর নামাযের সময় এক তাসবীহ কলিমায়ে তায়্যিবাহ, এক তাসবীহ দরূদ শরীফ, এক তাসবীহ ইসতিগফার অর্থাৎ 'আসতাগফিরুল্লাহ' এ নিয়্যতেই পড়বেন। এটা হলো ন্যূনতম পরিমাণ। মনে চাইলে সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে যতটুকু সম্ভব বৃদ্ধি করে পড়বেন।

☆ যে কোনো দ্বীনি কাজ উদাহরণস্বরূপ, সালাম, মুসাফাহা, উযু, নামায, তিলাওয়াত, রোযা, সদকা-খায়রাত ইত্যাদি করার সময় এই নিয়্যতই রাখবেন যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহব্বত সৃষ্টি হয়।

☆ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত ও অনুগ্রহের কথা চিন্তা করবেন। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মানুষ বানিয়েছেন। অতঃপর মুসলমান অর্থাৎ আল্লাহর পছন্দনীয় একমাত্র ধর্ম ইসলামের অনুসারী বানিয়েছেন। আমাদেরকে মুসলমান বানানোর জন্য কয়েক পূর্বপুরুষকে ঈমানের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন। এরপর তিনি বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্ঠজন, সন্তানাদি, সুস্থতা, সুস্বাস্থ্য, সম্পদের মতো অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। এমন অনুগ্রহকারীকে খুশি করার ফিকির না করা বরং উল্টো তাঁর বিধিবিধানসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করা কত বড় নালায়েকী ও নিমকহারামী। (এটাকে দশ মিনিট চিন্তা করবেন)

☆ এটা চিন্তা করবেন যে, আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে। তার জন্য আমরা কী প্রস্তুতি নিয়েছি? এটা উপস্থিতির সময়। এটা ফয়সালারও দিন। এরপরে হয়ত চির শান্তির জান্নাত অথবা চির দুঃখের জাহান্নাম। (আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন)

সেখানে নামায, যাকাত, হজ্ব তথা সব কিছুর হিসাব কিতাব দিতে হবে। এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করা হবে, নিজ সন্তানদেরকে কুরআন শরীফ এবং আমার দ্বীনের শিক্ষা কেন দাওনি? অন্যান্য পার্থিব শিক্ষার জন্য পুরো জীবন কুরবান করে দিয়েছ, কিন্তু কুরআন শরীফ সহীহ করার কোনো চিন্তাই তোমার ছিল না। ইসলামী জ্ঞান অর্জনের কোনো গরজও বোধ করোনি।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বিপদ-আপদ : কারণ ও প্রতিকার

পরিবর্তনশীলতার নাম জীবন :

মানব জীবনে রয়েছে অসংখ্য বৈপরীত্বের সমাহার। আনন্দ-ফুর্তি, দুঃখ-দুশ্চিন্তার সংমিশ্রণ। চোখের পলকেই আপদ-বিপদ। আবার মুহূর্তের মধ্যে সুখ-শান্তির মহানন্দ। কিন্তু এ দুনিয়ার সুখ-শান্তি চিরস্থায়ী নয়। দুঃখ-কষ্টও অস্থায়ী। পুরো জীবনের গতিবিধিই পরিবর্তনশীল। তবে এটা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, আনন্দময় মুহূর্তগুলো অনুভূতিহীনভাবে চলে যায়, টেরও পাওয়া যায় না। শান্তিময় দীর্ঘ সময়ও খুব কম মনে হয়। বিপরীতে বিপদাপদ দুঃখ-দুর্দশা জীবনের ভিতকে নড়বড়ে করে দেয় এবং একেকটি মুহূর্ত তার কাছে দীর্ঘ অতি দীর্ঘ মনে হয়। আসলে মানুষের ফিতরতই এমন যে, সে সুখে অভ্যস্ত। দুঃখের সামান্য ছোঁয়া পেলেও শুরু হয়ে যায় আষাঢ়ের বর্ষা। অতিষ্ঠ হয়ে যায়, বিষিয়ে উঠে জীবন এবং মনে হবে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দুঃখ-কষ্টের এক অসহনীয় মুহূর্ত। হাজারো অভিযোগ-অনুযোগ তার মুখে শোনা যাবে। নিজেকে হতভাগা-দুর্ভাগা কপাল পোড়া ভাবতে থাকে।

বিপদাপদে কামিল মু'মিন :

কিন্তু একজন কামিল মু'মিনের চরিত্র এমন হতে পারে না যে, দুঃখের দিনে সে ধৈর্যহারা হয়ে যাবে। বরং তার ঈমানী শক্তি, আল্লাহর সাথে মজবুত সম্পর্ক, দৃঢ়তার সাথে তাকে এসব পরিস্থিতির মোকাবিলা করার শিক্ষা দেয়। সে তো জীবনের নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিকগুলোকে আল্লাহর ইচ্ছায় হয় বলে বিশ্বাস করে। ফলে সে অভিযোগ-অনুযোগ, অকৃজ্ঞতা, দোষারোপ করা এবং অভিশাপ দেয়া থেকে মুক্ত থাকে। এভাবেই সে নিঃশেষিত সাময়িক দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে মোকাবিলা করে চির অমর হয়ে থাকে।

কল্যাণ-মঙ্গলের জন্মস্থান :

মানব জীবনের এই ওঠানামা বাহ্যিক দৃষ্টিতে হতাশাজনক নৈরাশ্যতায় ঘেরা মনে হলেও এর প্রকৃত রহস্য উন্মোচন হলে এবং শরয়ী দৃষ্টিকোণে নেতিবাচক পরিস্থিতিগুলোর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দুঃখ-কষ্ট একজন মু'মিনের জন্য কল্যাণই বয়ে আনে। এর থেকেই অস্তিত্ব লাভ করে অসংখ্য কল্যাণ ও মঙ্গলজনক দিক।

বোঝার উপায় :

দুঃখ-কষ্ট মানুষের জন্য কখন কল্যাণকর, কখন অকল্যাণজনক এটা নির্ণয় করার উপায়ও উলামায়ে কেরাম বলে দিয়েছেন, যদি মানুষ আপদ মুসীবতের সময় আল্লাহমুখী হয়, ইবাদত-বন্দেগী এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এই আপদ-মুসীবত, দুঃখ-দুর্দশা তার জন্য আল্লাহর রহমত বৈ কিছুই নয়। সে গুনাহগার হলে এই আপদ-মুসীবত তার গুনাহের জন্য কাফফারা হবে। আর নেককার হলে তার মর্তবা বুলন্দ হওয়ার উসিলামাত্র। এর বিপরীতে যদি সে মুসীবতের সময় নাফরমানী ও গুনাহের প্রতি আরো আগ্রহী ও আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তাহলে এটাই বুঝে নিতে হবে যে, এই মুসীবত তার বেলায় কঠোর শাস্তির পূর্ব পরোয়ানা। এটাই আল্লাহর আইন ও দস্তুর। ইরশাদ করেন-

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থাৎ এবং সেই বড় শাস্তির আগে আমি তাদেরকে অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদও আস্বাদন করাব। হয়তো তারা ফিরে আসবে। (সূরা সিজদা-২১)

আয়াত থেকে বুঝে আসে, আখিরাতের বড় শাস্তির আগে দুনিয়ায় মানুষের ছোট-বড় বিপদ-আপদ আসে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য। যাতে নিজেদের আমল অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ করে গুনাহ হতে নিবৃত্ত হয়। অতএব, দুনিয়ার জীবনে কখনো কোনো মুসীবত দেখা দিলে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিজেকে সংশোধন করে নেয়াই কুরআনের শিক্ষা, যা মুসীবত থেকে উত্তরণ এবং আখেরাতে নাজাতের উসিলা হবে।

মুক্তির উপায় :

মানুষ দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন পেরেশানি ও সমস্যার সম্মুখীন হবে। এটাই বাস্তবতা, তবে এর প্রতিকার কী? কিভাবে এর থেকে মুক্তি লাভ হতে পারে? এর ব্যাপারে কয়েকটি কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. দুনিয়া দারুল ইমতেহান :

বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং এটাকে সহজতর করার সর্বোত্তম পদ্ধতি

হলো এই যে, মু'মিনের ভাবনা ও চিন্তা-চেতনায় এ কথা বদ্ধমূল হয়ে যেতে হবে যে, দুনিয়া দারুল ইমতেহান (বিপদ-আপদের জায়গা) এর অস্তিত্ব অস্থায়ী, চিরস্থায়ী নয়। এটা আমলের স্থান। আর আখেরাত দারুল জাযা প্রতিদান পাওয়ার স্থান। দেখুন! একজন শ্রমিক সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে এই আশা বুকে ধারণ করে যে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই মজুরি পেয়ে যাবে। অনুরূপ একজন কৃষক হালচাষ ও বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত সব ধরনের কষ্টক্লেশ, শীতের প্রকোপ, সূর্যের তাপদাহ হাসিমুখে অবলীলায় সয়ে যাচ্ছে, মৌসুম শেষে ফসল ঘরে উঠানোর আশায়। তদ্রূপ একজন খাঁটি মু'মিনও দ্বীনের ওপর চলতে গেলে বিভিন্ন বাঁধার সম্মুখীন হবে। অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যায় জর্জরিত হবে, তবে এসব কিছুই তাকে গুনাহ মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য। আখেরাতেরও সুখ-শান্তি এবং সেখানের নেয়ামত রাজির বিনিময়ে দুনিয়ার এসব মুসীবত একেবারে গৌণ। দুনিয়ায় আল্লাহর দস্তুর এটাই যে, যে ব্যক্তি যত বেশি আল্লাহর প্রিয় হবে, সে তত বেশি এখানে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। হাদীস শরীফে দুনিয়াকে মু'মিনের জন্য কয়েদখানা বলা হয়েছে। আর এটা সবার কাছেই স্পষ্ট যে, কয়েদখানায় কেউ ঘরের মতো সুযোগ-সুবিধা পায় না। এজন্যই হাদীসে বিপদ-আপদকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো-

ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی الرجل علی حسب دینه فان کان فی دینه صلبا اشتد بلاء ه وان کان فی دینه رقة هون علیه فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکه یمشی علی الارض ماعلیه خطیئة

"সবচেয়ে কঠিন মুসীবত ও সমস্যার সম্মুখীন কারা হয়? হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন, সবচেয়ে বেশি কঠিন মুসীবতের সম্মুখীন হন নবীগণ, এরপর স্তর অনুযায়ী নেককার লোকেরা। ব্যক্তি মুসীবতের সম্মুখীন দ্বীন অনুপাতে হয়ে থাকে। দ্বীনদারীতে কঠোর ও দৃঢ় হলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়। অন্যথায় পরীক্ষা হালকা ও সহজ হয়। বান্দা মুসীবতের অক্টোপাসে ততক্ষণ পর্যন্ত বেষ্টিত থাকে, যতক্ষণ না মুসীবতের কারণে) গুনাহ ধুয়েমুছে বে-গুনাহ নিষ্পাপ হয়ে দুনিয়াতে বিচরণ করতে থাকবে। (তিরমিযী হা. ২৩৯৮)

ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله عزوجل اذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, পরীক্ষা যত বড় হবে প্রতিদানও তত বড় হবে। আল্লাহ তা'আলা যে জাতিকে চান পরীক্ষায় ফেলেন। এর পরীক্ষায় যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি রাজিখুশি থাকবে আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। আর যে নারাজ হয় আল্লাহও তার প্রতি নারাজ হন। (মিশকাত-১৩৬)

মোটকথা হলো, যার অন্তরে এ বিশ্বাস থাকবে যে, দুনিয়ায় মুসীবতের পরিবর্তে আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টিও জান্নাত রয়েছে। তার কাছে দুনিয়ার অনেক সমস্যা সমস্যাই মনে হবে না।

২. মুসীবত গুনাহ মাফের উসিলা :

মুসীবত ও দুঃখ-বেদনাকে দূর করার আরেকটি সহজ নুসখা (ফর্মুলা) হলো–

ক. আক্রান্ত ব্যক্তি তার অসুস্থতা, পেরেশানি, অভাব-অনটনের মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি আখেরাতের সওয়াব, গুনাহ এবং জীবনের অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্রতা ও ক্ষমার সুসংবাদকে সামনে রাখা। এর দ্বারা তার ঈমান-ইয়াকীন বাড়বে। আখেরাতের ফিকির পয়দা হবে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

مایصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذی ولا غم حتی الشوکة یشاکها الا کفر الله بها من خطایاه

অর্থাৎ মু'মিন যেই দুঃখ, দুর্দশা, অসুস্থতা, পেরেশানি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, বিষাদ এবং কষ্টক্লেশ ভোগে এমনকি তার পায়ে যেই কাঁটা বিদ্ধ হয় এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেন। (বুখারী-৫৬৪২)

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) হযরত উম্মে সায়েব (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন–

لاتسبی الحمی فانها تذهب خطایا بنی آدم کما یذهب الکیر الحدید

অর্থাৎ তুমি জ্বরকে গালি দিও না, কারণ এই জ্বর আদম সন্তানের গুনাহকে এমনভাবে দূর করে, যেভাবে কামারের হাপর লোহার ঝং দূর করে। (মুসলিম-২৫৭৫)

খ. আল্লাহ তা'আলা যার ভালো চান তাকে দুঃখ-কষ্টে, বিপদ-আপদে ভোগান। তাকে আখেরাতের আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য দুনিয়াতেই তার গুনাহের প্রাপ্ত শাস্তি দিয়ে দেন। ফলে আখেরাতের ভয়াবহ শাস্তি থেকে রেহাই পায়। আর যার মন্দ চান, তাকে দুনিয়াতে প্রাপ্ত শাস্তি না দিয়ে আখেরাতে পুরোপুরি দেবেন। (তিরমিযী হা. ২৩৯৬)

গ. কখনো এমন হয় যে, একজন মু'মিন

আখেরাতের বিবেচনায় একটি মর্যাদা ও স্থানের অধিকারী কিন্তু পারিপার্শিক বিভিন্ন কারণে সে তার স্থানের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাকে তার গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা এভাবে করেন যে, তার ওপর বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্টের বোঝা চাপিয়ে দেন এবং এর মধ্যেমে তাকে গুনাহমুক্ত করে বা দরজা বুলন্দ করে মরতবা মর্যাদার নির্দিষ্ট আসনে অধিষ্ঠ করেন। রাসূল (সা.) বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

ان العبد اذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها ابتلاه الله فى جسده او فى ماله او فى ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التى سبقت له من الله۔

অর্থাৎ যখন বান্দার জন্য আল্লাহর তরফ হতে একটি স্থান বরাদ্দ হয়, যা সে নিজ আমল দ্বারা অর্জন করতে পারে না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার জানমাল অথবা সন্তানের দিক দিয়ে বিপদ-আপদে ফেলবেন এবং এর ওপর ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দান করবেন। এভাবেই তাকে তার জন্য বরাদ্দকৃত স্থানে পৌঁছিয়ে দেন। (আবু দাউদ হা.৩০৯০)

মুসীবত আল্লাহর নেয়ামত হওয়ার ওপর এই হাদীসটিও প্রমাণ বহন করে যে-

يود اهل العافية يوم القيامة حين يعطى اهل البلاء الثواب لوان جلودهم كانت قرضت فى الدنيا بالمقاريض۔

"কিয়ামতের দিন যখন দুনিয়ার বিপদগ্রস্তদের ধৈর্যের প্রতিদানস্বরূপ সওয়াব দেয়া হবে তখন দুনিয়ার সুখী ও আয়েশীরা (ঈর্ষান্বিত হয়ে) কামনা করবে যে, আহ! দুনিয়ায় আমাদের শরীরের চামড়া যদি কেঁচি দ্বারা কাটা হতো। (তিরমিযী হা. ২৪০২)

একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وعزتى وجلالى لااخرج احدا من الدنيا اريد اغفرله حتى استوفى كل خطيئة فى عنقه بسقم فى بدنه واقتار فى رزقه۔

"আমার ইজ্জত ও জালালের কসম! আমি যাকে ক্ষমা করার ইচ্ছা করি তাকে অসুস্থতায় ভুগিয়ে এবং অভাব-অনটনে ফেলে তার সব ধরনের গুনাহ ও ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দিই। (মিশকাত হা. ১৫৮০)

অন্য হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

اذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه۔

'যখন বান্দার গুনাহের সংখ্যা বেড়ে যায়, আর এই পরিমাণ আমলও থাকে না, যা এর কাফফারা হতে পারে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহের কাফফারার জন্য তাকে বিভিন্ন পেরেশানিতে লিপ্ত করেন। (আহমদ হা. ২৪৭০৮)

৩. বিপদ-আপদে দু'আর গুরুত্ব :

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা জানা গেল যে, বিপদ-আপদের সময় বান্দা যদি আল্লাহর দিকে রুজু করে এবং ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি আগের চেয়েও বেশি মনোনিবেশ করে তাহলে এই বিপদ তার জন্য কোনো বিপদ নয়। বরং আল্লাহর অশেষ রহমত।'

কিন্তু বান্দা হিসেবে যেহেতু আমরা অত্যন্ত কমজুর দুর্বল। আল্লাহর রহমত চিনতে অক্ষম। আখেরাতের কল্যাণের ব্যাপারে অনবগত, তাই অন্যদের মতো নিজেকেও সচ্ছল এবং সর্বপ্রকার বিপদমুক্ত দেখতে চাই। ফলে বিপদে ধৈর্য ধারণ করার মতো হিম্মত নিজেদের খুঁজে পাই না। এসব কারণে আমাদেরকে আল্লাহর কাছে আফিয়াত এর দু'আ করতে হবে। দু'আর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিতে হবে। মিনতির স্বরে আল্লাহর কাছে এভাবে ফরিয়াদ করতে হবে যে, হে আল্লাহ! অসুস্থতা এবং সুস্থতা দুটিই তোমার নেয়ামত, তবে তোমার এই বান্দা কমজুর দুর্বল। অসুস্থতার নেয়ামতের কদর করার সামর্থ্য নেই। অতএব এই নেয়ামতকে সুস্থতার নেয়ামত দ্বারা পরিবর্তন করে দাও। হে আল্লাহ! অভাব-অনটন তোমার নেয়ামত, সচ্ছলতাও তোমার নেয়ামত। কিন্তু বান্দা হিসেবে আমি দুর্বল তাই অভাব-অনটনকে সচ্ছলতার নেয়ামত দ্বারা বদলিয়ে দাও।

আরে ভাই! আসল কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা তো বান্দাকে মুসীবতে ফেলেন তার কাছে আকুতি-মিনতি করার জন্য। নিজের অপারগতা অক্ষমতা প্রকাশে দু'আর চেয়ে বড় মাধ্যম আর কী হতে পারে? এর জন্যই তো রাসূল (সা.) দু'আকে مخ العبادة অর্থাৎ ইবাদতের সার আখ্যায়িত করেছেন।

বিপদগ্রস্তের দু'আ :

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কয়েকটি দু'আর প্রতি খুব গুরুত্ব দেবে। নিম্নে কয়েকটি দু'আ পেশ করা হলো–

اللهم رحمتك ارجوفلا تكلنى الى نفسى طرفة عين واصلح لى شانى كله لا اله الا انت

ক. হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতের আকাঙ্ক্ষা করি। চোখের পলকের জন্যও তুমি আমাকে আমার ওপর ন্যস্ত করো না। তুমি আমার জন্য সব কিছুর ব্যবস্থা করে দাও। তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

খ. يـاحى يا قيوم برحمتك استغيث হে অমর অবিনশ্বর! আমি তোমার রহমতের উসিলায় ফরিয়াদ করছি।

গ. اللـه اللـه ربى لا اشرك بـه شيئـا আল্লাহ, আল্লাহ আমার রব। আমি তার সাথে কাউকে শরীক করি না।

বিপদ-আপদ ও পেরেশানি দূর করার ক্ষেত্রে এসব দু'আর অনেক প্রভাব রয়েছে। স্বয়ং রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে বিপদের সময় এসব দু'আর উপদেশ দিতেন। (হায়াতুস সাহাবা ৩/৫৩১)

৪. মুসীবতের সময় নেককারদের সাথে পরামর্শ :

মানুষ অসুস্থতা, পেরেশানি ও বিপদের মুহূর্তগুলোতে নিজেকে অসহায় সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন একাকী ভাবতে থাকে। সে নিজের বিবেক বুদ্ধি, পরিকল্পনা এবং বাহ্যিক সব ধরনের উপায় উপকরণ অবলম্বন করার পরও বিপদ ও পেরেশানিমুক্ত হওয়ার কোনো পথ তার সামনে দৃশ্যমান হয় না। দু'আর প্রতি গুরুত্ব দেয়ার পরও দেখা যায় পেরেশানি দূর হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। এমতাবস্থায় সুখ-শান্তি সন্ধানীর জন্য আবশ্যকীয় আরেকটি বিষয় হলো, এ ব্যাপারে আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে পরামর্শ করা। তাদের নির্দেশিত ও প্রদর্শিত ছক অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালনা করা।

৫. মুসীবতে তদবীর করা :

অসুস্থ হলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না, তাকদীরে যা আছে হবে এই বাহানা দিয়ে কোনো তদবীর (উপায় অবলম্বন) করার বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না। বরং চিকিৎসা ও ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। বেকার হলে বেকারত্ব গোচানোর চেষ্টা করতে হবে।

মোটকথা হলো, মুসীবত দূর করার জন্য শর্তানুযায়ী উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে হবে। তবে ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেবে। তাওয়াক্কুলের বাস্তবতাও এটাই। হযরত ওমর (রা.)-এর ভাষায়-

نفر من قدر الله الى قدر الله.

'তদবীর অবলম্বন করা মূলত আল্লাহর একটি তাকদীর থেকে তারই আরেকটি তাকদীরের দিকে ধাবিত হওয়ার নাম।" (বুখারী হা. ৫৩৯৭)

এ ধরনের তদবীর অবলম্বনকারীদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

ان الله يحب المتوكلين

আল্লাহ তা'আলা তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আফিয়াতের জীবন দান করুন। আমীন!

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

Shop # 10, Green Super Market (Ground Floor) Green Road Dhaka 1205, Bangladesh
Tel : 0088-02-9135987 Fax : 0088-02-8121538 Mobile : 0088-01675 209494, 01819 270797
E-mail: taosif07@gmail.com

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 09
80/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039,
Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

Monalisa Tiles

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta Road
Hatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424,
Mobile: 01675303592, 01711527232

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

হাদীস ও সুন্নাহ : বিভ্রান্তি ও নিরসন

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

অনেক সহীহ হাদীস রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে হাদীসের কিতাবের সকল হাদীস আমলযোগ্য নয়, শুধু যেসব হাদীস সুন্নাহ পর্যায়ের তার ওপর আমল করতে হবে, যার সারমর্ম হলো ফিকহের কিতাবসমূহ। এ সম্পর্কে কিছু হাদীস ও আছার নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিচ্ছি এবং আমীরের কথা শুনতে ও তার অনুগত থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহকে এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। অতএব সাবধান! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর বাহিরে নতুন কথা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন কথাই বিদ্আত। (সুনানে দারেমী হাদীস নং ৯৬)

২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন, হে প্রিয় বৎস! যদি তুমি এভাবে সকাল-সন্ধ্যা কাটাতে পারো যে, তোমার অন্তরে কারো প্রতিহিংসা নেই, তবে তা করো। অতঃপর তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! এটা আমার সুন্নাহ। আর যে আমার সুন্নাহকে যিন্দা করল সে আমাকেই ভালোবাসল। আর যে আমাকে ভালোবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ২৬৮৩)

৩. হযরত মালেক (রহ.) থেকে বর্ণিত, তার নিকট পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে জিনিস দুটি আঁকড়ে ধরবে পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। (মুয়াত্তা মালেক হাদীস নং ৬৮৫)

৪. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল খাবে এবং সুন্নাহর ওপর আমল করবে এবং যার অনিষ্ট থেকে সকল মানুষ নিরাপদ থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর এক লোক বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল, এমন লোক তো আজকাল অনেক। হুজুর বললেন, আমার পরবর্তী যুগসমূহেও এমন লোক থাকবে। (তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ২৫২৫)

৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কিছু সাহাবী রাসূলের বিবিগণকে মানুষের অগোচরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর তাদের কেউ বললেন, আমি মহিলাদের বিবাহ করব না। কেউ বললেন, আমি আর গোশত খাব না। আর কেউ বললেন, আমি আর বিছানায় ঘুমাব না। অতঃপর নবী আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রসংশা করলেন এবং ছানা পড়লেন আর বললেন মানুষের কী হলো? তারা এমন এমন বলে! অথচ আমি নামায পড়ি এবং ঘুমাই, নফল রোযা রাখি এবং ছেড়েও দিই এবং আমি মহিলাদের বিবাহও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৪০১)

৬. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহসমূহের এমন কোনো সুন্নাহকে যিন্দা করেছে, যা আমার পরে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল তার জন্য সে সকল লোকের সওয়াবের পরিমাণ সওয়াব রয়েছে, যারা এর ওপর আমল করবে। অথচ তাদের থেকে বিন্দু পরিমাণ সওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো গোমরাহীর নতুন পথ আবিষ্কার করেছে, যার ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রাজি নন, তার জন্য সে সকল লোকের গুনাহের পরিমাণ গুনাহ রয়েছে, যারা এর ওপর আমল করবে। অথচ তাদের গুনাহ থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না। (তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ২৬৮২)

৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম্য) বিদায় হজ্বের সময় খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছে যে, তোমাদের এই যমীনে তার ইবাদত করা হবে। তবে ইবাদত ব্যতীত তোমরা যে সব আমলকে ছোট মনে করো সেসব জিনিসে তার আনুগত্য করা হবে এ ব্যাপারে সে আশাবাদী। অতএব হে

মানবসকল সাবধান! আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ। (মুসতাদরাকে হাকেম ১/৯৩)

৮. হযরত ইবনে হারেস ছুমালী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখনই কোনো জাতি একটি বিদআত সৃষ্টি করেছে তখনই একটি সুন্নাহকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোনো সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা বিদআত সৃষ্টি করা থেকে উত্তম। (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ১৬৯৭২)

৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, প্রতিটি কাজের উত্থান রয়েছে। আর প্রতিটি উত্থানের একটি স্থিতিশীলতা রয়েছে। অতএব যার উত্থান আমার সুন্নাহর দিকে হবে, সে সফলকাম। আর যার উত্থান আমার সুন্নাহ ব্যতিরেকে হবে সে ধ্বংস। সহীহে ইবনে হিব্বান হাদীস নং ১১১০।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ইলম তিন প্রকার; আয়াতে মুহকামার ইলম, সুন্নাতে কায়েমার ইলম এবং ফরীযায়ে আদেলার ইলম। এ ছাড়া সব অতিরিক্ত। (আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং ২৮৮৫)

উপরোল্লিখিত প্রতিটি হাদীসে সুন্নাহর অনুসরণের এবং তা আঁকড়ে ধরার কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের হাদীস বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে নমুনাস্বরূপ কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো মাত্র। কিন্তু এমন কোনো হাদীস পাওয়া যায় না, যেখানে হাদীসের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। কেননা হাদীস সুন্নাহ থেকে ব্যাপক। রহিত হাদীসসমূহ এবং নবী আলাইহিস সালামের সাথে বা কোনো সাহাবীর সাথে খাস হুকুমসমূহ হাদীস হলেও সুন্নাহ নয়, বরং সুন্নাহ হলো নবী আলাইহিস সালাম উম্মতের অনুসরণের জন্য যা রেখে গেছেন এবং তা কখনো রহিত হয়নি। এজন্য নাজাতপ্রাপ্ত দলের নাম রাখা হয়েছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ। অর্থাৎ যারা রাসূলের সুন্নাহকে সাহাবায়ে কেরামের জামাআতের মাধ্যমে অনুসরণ করে।

কোন হাদীস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত আর কোনটি সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা হক্কানী উলামাদের নিকট স্পষ্ট। হাদীসের কিতাব অধ্যয়ন করে জনগণের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়, সুতরাং উলামায়ে কেরাম থেকে না বুঝে একা একা হাদীস রিসার্চ করে আমল করা মারাত্মক গোমরাহী।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম
বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

সদকায়ে ফিতর ও ঈদ

তাৎপর্য, ফযীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

সদকাতুল ফিতরের বিধান

হাদীসে এসেছে-

'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোযাদারের জন্য সদকাতুল ফিতর আদায় অপরিহার্য করে দিয়েছেন, যা রোযাদারের অনর্থক, অশ্লীল কথা ও কাজ পরিশুদ্ধকারী ও অভাবী মানুষের জন্য আহারের ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত। যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে এটা আদায় করবে তা সদকাতুল ফিতর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে ঈদের নামাযের পর আদায় করবে তা অপরাপর (নফল) সদকা হিসেবে গৃহীত হবে।' (আবু দাউদ ১৩৭১)

☆ সদকাতুল ফিতর কার ওপর ওয়াজিব?

ওই ব্যক্তির ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব, যে ঈদের দিন ভোরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হিসেবে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সমপরিমাণ সম্পদের মালিক। যার ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব তিনি নিজের পক্ষ থেকে যেমন আদায় করবেন, তেমনি নিজের পোষ্যদের পক্ষ থেকেও আদায় করবেন।

☆ সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ :

গম ও আটার হিসেবে অর্ধ সা' (১৬৫০ গ্রাম) অথবা তার সমমূল্য। খেজুর, কিসমিস, জবের হিসেবে এক সা' (৩৩০০ গ্রাম) অথবা তার সমমূল্য।

☆ কখন আদায় করবেন সদকাতুল ফিতর?

সদকাতুল ফিতর আদায় করার দুটো সময় আছে। একটি হলো উত্তম সময়, অন্যটি বৈধ সময়। আদায় করার উত্তম সময় হলো ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে।

যেমন হাদীসে এসেছে-

'ইবনে উমর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।' (মুসলিম শরীফ ১৬৩৬)

☆ সদকাতুল ফিতর কাকে দেবেন?

যারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত–এমন অভাবী লোকদেরকে সদকাতুল ফিতর প্রদান করা যাবে। একজন দরিদ্র মানুষকে একাধিক ফিতরা দেয়া যেমন জায়েয আছে, তেমনি একটি ফিতরা বণ্টন করে একাধিক মানুষকে দেয়াও জায়েয।

ঈদের তাৎপর্য

হাদীস শরীফে আছে–

'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনাতে আগমন করলেন তখন মদীনাবাসীদের দুটো দিবস ছিল, যে দিবসে তারা খেলাধুলা করত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, এ দুই দিনের কী তাৎপর্য আছে? মদীনাবাসীগণ উত্তর দিলেন : আমরা মূর্খতার যুগে এ দুই দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ দুই দিনের পরিবর্তে তোমাদেরকে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটো দিন দিয়েছেন। তা হলো ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর।' (আবু দাউদ ৯৫৯)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মদীকে সম্মানিত করে তাদের এ দুটো ঈদ দান করেছেন। আর এ দুটো দিন বিশ্বে যত উৎসবের দিন ও শ্রেষ্ঠ দিন রয়েছে, তার সব কটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন ও সেরা ঈদ।

ইসলামের এ দুটো উৎসবের দিন শুধু আনন্দ-ফুর্তির দিন নয়। বরং এ দিন দুটোকে খুশি-আনন্দের সাথে সাথে জগৎসমূহের প্রতিপালকের ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা করবে সুসজ্জিত। যিনি জীবন দান করেছেন, দান করেছেন সুন্দর আকৃতি, সুস্থ শরীর, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, যার জন্য জীবন ও মরণ তাকে এ আনন্দের দিনে ভুলে যাওয়া কিভাবে মেনে নেয়া যায়? তাই ইসলাম আনন্দ-উৎসবের এ দিনটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত-বন্দেগী, তার প্রতি শুকরিয়া-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা সুসজ্জিত করেছে।

ঈদের দিনের করণীয়

☆ গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা। ঈদের দিন গোসল করার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা মুস্তাহাব। কেননা এদিনে সকল মানুষ নামায আদায়ের জন্য মিলিত হয়। যে কারণে জুমু'আর দিন গোসল করা মুস্তাহাব সে কারণেই ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। হাদীসে এসেছে-

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন। সায়ীদ ইবনে

মুসাইয়িব (রহ.) বলেন : ঈদুল ফিতরের সুন্নত তিনটি : ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া, ঈদগাহের দিকে রওনা হওয়ার পূর্বে মিষ্টিজাতীয় কিছু খাওয়া, গোসল করা। (মুআত্তা ইমাম মালেক)

এমনিভাবে সুগন্ধি ব্যবহার ও উত্তম পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব।

☆ ঈদের দিনে খাবার গ্রহণ

সুন্নত হলো ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদের নামায আদায়ের পূর্বে মিষ্টিজাতীয় খাবার গ্রহণ করা। আর ঈদুল আজহার দিন ঈদের নামাযের পূর্বে কিছু না খেয়ে নামায আদায়ের পর কুরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নত। হাদীস শরীফে এসেছে-

বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিনে না খেয়ে বের হতেন না, আর ঈদুল আজহার দিনে ঈদের নামাযের পূর্বে খেতেন না। নামায থেকে ফিরে এসে কুরবানীর গোশত খেতেন। (মুসনাদে আহমদ ১৪২২)

☆ পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া

ঈদগাহে তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত। যাতে ইমাম সাহেবের নিকটবর্তী স্থানে বসা যায় ও ভালো কাজ অতি তাড়াতাড়ি করার সওয়াব অর্জন করা যায়, সাথে সাথে নামাযের অপেক্ষায় থাকার সওয়াব পাওয়া যায়। ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া মুস্তাহাব। হাদীসে এসেছে-

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'সুন্নত হলো ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া।' (তিরমিযী ১৮৭)

আর একটি সুন্নত হলো : যে পথে ঈদগাহে যাবে সে পথে না ফিরে অন্য পথে ফিরে আসা। যেমন হাদীসে এসেছে-

জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদগাহে যে পথে যেতেন, ফিরতেন ভিন্ন পথে।' (বুখারী শরীফ ১৪৫)

☆ ঈদের তাকবীর আদায়

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন। ঈদের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন। যখন নামায শেষ হয়ে যেত তখন আর তাকবীর পাঠ করতেন না। আর কোনো কোনো বর্ণনায় ঈদুল আজহার ব্যাপারে একই কথা পাওয়া যায়। আরো প্রমাণিত আছে যে ইবনে উমর (রা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করতেন। ঈদগাহে এসে ইমামের আগমন পর্যন্ত এভাবে তাকবীর পাঠ করতেন।

ঈদের নামায

☆ ঈদের নামাযের হুকুম

'ঈদের নামায প্রত্যেক মুসলমান বালেগ পুরুষের ওপর ওয়াজিব।

☆ ঈদের নামাযের পূর্বে কোনো নামায নেই

হাদীসে এসেছে-

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিনে বের হয়ে দুই রাকা'আত ঈদের নামায আদায় করেছেন। এর পূর্বে ও পরে অন্য কোনো নামায আদায় করেননি।' (বুখারী শরীফ ৯৩৫)

ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতি

ঈদের নামায হলো দুই রাকা'আত। হাদীসে এসেছে-

উমর (রা.) বলেন : 'জুমু'আর নামায দুই রাকা'আত, ঈদুল ফিতরের নামায দুই রাকা'আত, ঈদুল আজহার নামায দুই রাকা'আত ও সফর অবস্থায় নামায হলো দুই রাকা'আত।' (নাসায়ী ১৪০৩)

ঈদের নামায শুরু হবে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে।

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত প্রত্যেক তাকবীরের পর হাত উঠাবে। প্রথম রাকা'আতে তাকবীরসমূহ আদায় করার পর সূরা ফাতেহা পড়বে, তারপর যে কোনো সূরা পড়বে। দ্বিতীয় রাকা'আতে কেরাত শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত তাকবীর বলবে এবং রুকুতে যাবে। নামায শেষ হওয়ার পর ইমাম সাহেব খুতবা দেবেন। মনে রাখা দরকার, ঈদের খুতবা হবে নামায আদায়ের পর। নামায আদায়ের পূর্বে কোনো খুতবা নেই। হাদীসে এসেছে-

আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশে রওনা হতেন। ঈদগাহে প্রথমে নামায শুরু করতেন। নামায শেষে মানুষের দিকে ফিরে খুতবা দিতেন, এ খুতবাতে তিনি তাদের ওয়াজ করতেন, উপদেশ দিতেন, বিভিন্ন নির্দেশ দিতেন। আর এ অবস্থায় মুসল্লীগণ তাদের কাতারে বসে থাকত।' (বুখারী শরীফ ৯০৩)

ঈদের নামায অতিরিক্ত ৬ তাকবীরে পড়া সুন্নত

১. "আবু আব্দুর রহমান কাসেম (রহ.) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিন আমাদেরকে ঈদের নামায পড়ান, এর প্রতি রাকা'আতে তিনি চারটি করে তাকবীর বলেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ভুলে যেয়ো না, জানাযার নামাযের তাকবীরের মতো চারটি করে তাকবীর হবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে অবশিষ্ট চারটি আঙুল দিয়ে তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেন। (তাহাবী শরীফ ৪/৩৪৫, হাদীস নং ১৬৫৯)

২. "হযরত সাঈদ ইবনুল আস হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) ও হুযাইফা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে কয়

তাকবীর দিতেন? উত্তরে তিনি বলেন, জানাযার নামাযের তাকবীরের সমসংখ্যক (চার) তাকবীর দিতেন। তখন হুযাইফা (রা.) বলেন, ঠিক বলেছেন। আবু মূসা (রা.) আরো বলেন, আমি যখন বসরার গভর্নর ছিলাম, ঈদের নামাযে এভাবে চার তাকবীর দিতাম। আবু আয়েশা বলেন, এ ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী, সাঈদ ইবনে আসের সঙ্গে আমিও ছিলাম।

ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় উল্লেখ আছে, ঈদের নামাযে জানাযার নামাযের মতো চার তাকবীর হবে, বাক্যটি আমি আজও ভুলিনি। (আবু দাউদ ১/৬৮২, হাদীস নং ১১৫৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৪৯৪, হাদীস নং ৫৬৯৪, তাহাবী শরীফ ৪/৩৪৬, হাদীস নং ১৬৬১, মুসনাদে আহমদ ৪/৪১৬, হাদীস নং ১৯৩.

"হযরত আলকমা ও আসওয়াদ (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) উভয় ঈদের নামাযে ৯টি করে তাকবীর দিতেন। প্রথম রাকা'আতে কেরাআত পড়ার পূর্বে তাকবীরে তাহরীমা ও ঈদের তাকবীর মিলে চারটি তাকবীর। অতঃপর রুকুর জন্য তাকবীর বলে রুকুতে যেতেন। আর দ্বিতীয় রাকা'আতে কেরাআত শেষ করে ঈদের তিন তাকবীর ও রুকুর একটি তাকবীর মিলে চারটি তাকবীর দিতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/২৯৩, হাদীস নং ৫৬৮৬, তাবরানী-কাবীর ৯/৩৫২, হাদীস নং ৯৫১৭)

৪. "ইবনে হারেস বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বসরায় ঈদের নামায পড়ার সময় ৯টি তাকবীর দিতে দেখেছি। আরো বলেন, আমি সাহাবী মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.)-কেও এমনই করতে দেখেছি। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/২৯৫, হাদীস নং ৫৬৮৯)

৯ তাকবীর কোন কোনটি তা উপরের হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

৫. "হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) এক ব্যক্তিকে বায়আতে রিজওয়ানে অংশগ্রহণকারী চারজন সাহাবীর নিকট প্রেরণ করেন, ঈদের নামাযে তাদের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। জিজ্ঞাসার পর তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে উত্তর আসে "ঈদের নামায (রুকুতে যাওয়ার দুই তাকবীরসহ) ৮ তাকবীর হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এই বিবরণ আমি ইবনে সীরীন (রহ.)-কে জানালে তিনি বলেন, "ঠিক বলেছেন।" (তবে ঈদের নামাযের ৬ তাকবীর এবং রুকুতে যাওয়ার দুই তাকবীর মিলে ৮ তাকবীরই হয়) কিন্তু এর পূর্বে প্রথম রাকা'আতে নামায শুরু করার তাকবীরের কথা এখানে উল্লেখ করেননি। (তাই ৮ তাকবীর বলেছেন, অন্যথায় মোট ৯ তাকবীর হতো) (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৮৯৪, হাদীস নং ৫৬৯৫)

৬. "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আমাদেরকে একবার ঈদের নামায পড়ান। এতে তিনি মোট ৯ তাকবীর দেন। প্রথম রাকা'আতে (তাকবীরে তাহরীমা ও ঈদের নামাযের ৩ তাকবীর ও রুকুতে যাওয়ার তাকবীরসহ) ৫টি তাকবীর। আর দ্বিতীয় রাকা'আতে (ঈদের নামাযের ৩ তাকবীর ও রুকুতে যাওয়ার তাকবীর মিলে) ৪টি তাকবীর দেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৪৯৫, হাদীস নং ৫৭০৭)

৭. "হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত আনাস (রা.) বলেন, ঈদের নামাযে মোট তাকবীর সংখ্যা হলো ৯টি। নামায শুরু এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরসহ প্রথম রাকা'আতে ৫টি এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে ৪টি। (ত্বাহাবী শরীফ ৪/৩৪৮, হাদীস নং ১৬৭৪)

৭. "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ঈদের নামাযের প্রতি রাকা'আতেই ধারাবাহিক চারটি তাকবীর প্রদান করতেন।"

(এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে মুফতী রফীকুল ইসলাম আলমাদানী লিখিত, ফক্বীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর কেন" বইটি দ্রষ্টব্য)

☆ ঈদে শুভেচ্ছা বিনিময় করা :

একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানো, অভিবাদন করা মানুষের সুন্দর চরিত্রের একটি দিক। এতে খারাপ কিছু নেই। বরং এর মাধ্যমে অপরের জন্য কল্যাণ কামনা ও দোয়া করা হয়। পরস্পরের মাঝে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। ঈদ উপলক্ষে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানো শরীয়ত অনুমোদিত একটি বিষয়। বিভিন্ন বাক্য দ্বারা এ শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। যেমন :

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেছেন : 'জোবায়ের ইবনে নুফাইর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবায়ে কেরাম ঈদের দিন সাক্ষাৎকালে একে অপরকে বলতেন :

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ،

'আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনার ভালো কাজগুলো কবুল করুন।' (আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারি : ১৭৫৮৯)

☆ আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নেয়া ও তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া :

সদাচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনের মাঝে সবচেয়ে বেশি হকদার হলো মাতা-পিতা। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সকল প্রকার মনোমালিন্য দূর করার জন্য ঈদ হলো একটা বিরাট সুযোগ। কেননা হিংসা-বিদ্বেষ ও আত্মীয়স্বজনের সাথে খারাপ সম্পর্ক এমন একটা বিষয়, যা আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। হাদীসে এসেছে-

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। যে আল্লাহর সাথে শিরক করে তাকে ব্যতীত সে দিন সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়; কিন্তু ওই দুই ভাইকে ক্ষমা করা হয় না, যাদের মাঝে হিংসা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। তখন (ফেরেশতাদেরকে) বলা হয়, এ দুজনকে অবকাশ দাও যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলেমিশে যায়! এ দুজনকে অবকাশ দাও যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলেমিশে যায়! এ দুজনকে অবকাশ দাও যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলেমিশে যায়!!' (মুসলিম শরীফ ৪৬৫২)

এ সকল হাদীসে ভাই বলতে শুধু আপন ভাইকে বোঝানো হয়নি বরং সকল মুসলমানকেই বোঝানো হয়েছে। হোক সে ভাই অথবা প্রতিবেশী কিংবা চাচা বা বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, সহপাঠী বা অন্য কোনো আত্মীয়। তাই যার সাথে ইতিপূর্বে ভালো সম্পর্ক ছিল, এমন কোনো মুসলমানের সাথে সম্পর্ক খারাপ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক অন্যায়। যদি কেউ এমন অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে তার এ অন্যায় থেকে ফিরে আসার এক মহা সুযোগ হলো ঈদ।

ঈদে যা বর্জন করা উচিত :

ঈদ হলো মুসলমানদের শান-শওকত প্রদর্শন, তাদের আত্মার পরিশুদ্ধতা, তাদের ঐক্য-সংহতি ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎসব। কিন্তু দুঃখজনক হলো বহু মুসলিম এ দিনটাকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে জানে না। তারা এ দিনে বিভিন্ন অনৈসলামিক কাজকর্মে মশগুল হয়ে পড়ে। এ ধরনের কিছু কাজকর্মের আলোচনা করা হলো :

☆ কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ বা আচরণ করা :

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্যতা রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।' (আবু দাউদ ৩৫১২)

☆ পুরুষ কর্তৃক মহিলার বেশ ধারণ করা ও মহিলা কর্তৃক পুরুষের বেশ ধারণ :

পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রে পুরুষের নারীর বেশ ধারণ ও নারী পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। ঈদের দিনে এ কাজটি অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। হাদীসে এসেছে-

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই সকল মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং ওই সকল পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন, যারা মহিলার বেশ ধারণ করে। (আবু দাউদ ৩৫৭৪)

☆ বেগানা মহিলা পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ :

মনে রাখতে হবে যে, মহিলাদের জন্য খোলামেলা ও অশালীন পোশাকে রাস্তাঘাটে বের হওয়া ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

'আর তোমরা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন মূর্খতার যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।' (আহযাব ৩৩)

হাদীসে এসেছে-

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'জাহান্নামবাসী দুই ধরনের লোক আছে, যাদের আমি এখনো দেখতে পাইনি। (আমার যুগের পরে দেখা যাবে) একদল লোক যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে প্রহার করবে। আর এক দল এমন মেয়ে লোক, যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ হবে। অন্যদের আকৃষ্ট করবে ও তারা অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে।' (মুসলিম : ৩৯৭১)

☆ বেগানা মহিলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ

অনেককে দেখা যায় অন্যান্য সময়ের চেয়ে এই গোনাহের কাজটা ঈদের দিনে বেশি করে। নিকটাত্মীয়দের মাঝে যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ শরীয়ত অনুমোদিত নয়, তাদের সাথে অবাধে দেখা-সাক্ষাৎ করা হয়। হাদীসে এসেছে-

সাহাবী উকবাহ ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'তোমরা বেগানা মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবে।' আনসারী সাহাবীদের মধ্য থেকে এক লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! দেবর-ভাসুর প্রমুখ আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি উত্তরে বললেন : ' এরা তো মৃত্যুর সমতুল্য।' (মুসলিম শরীফ ৪০৩৭)

এ হাদীসে আরবী حمو শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এমন সকল আত্মীয়, যারা স্বামীর সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটতম। যেমন স্বামীর ভাই, তার মামা, খালু প্রমুখ। তাদেরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করার কারণ হলো, এ সকল আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমেই বেপর্দাজনিত কেলেঙ্কারি বেশি ঘটে থাকে।

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৭

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

পয়সা *Pices*-এর আসল প্রকৃতি ও হাকীকত :

আরবী ভাষায় فلوس বহুবচন, একবচন হলো فلس যার অর্থ পয়সা। পরিভাষায় তাম্রের গলানো ওই টুকরাকে পয়সা বলা হয়, যা সর্বসাধারণের মাঝে মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত হয়।

পয়সার অগ্রগতির ধাপসমূহ :

১। জাহেলী যুগে অর্থাৎ ইসলামের পূর্বে এবং ইসলাম-পরবর্তী একটা সময় পর্যন্ত মানুষ পয়সার স্থলে ডিম, গম ইত্যাদি ব্যবহার করত।

২। এরপরে মানুষ তাম্রের টুকরার ব্যবহার শুরু করল, যা গলানো ছিল না।

৩। এরপরে পয়সা গলানো শুরু হয়। এবং আইনগত রূপ দেওয়া হয়। প্রতিটি পয়সার এক পিঠে ওই সময়ের বাদশাহের নাম/উপাধি খোদাই করা থাকত এবং অপর পিঠে থাকত ওই দেশের নাম, বানানোর সন। ওই সময় থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পয়সার প্রচলন শুরু হয়। ৭৮১ ইংরেজিতে বাদশাহ জাহেবেবার কুকের শাসনামলে পয়সার বেশ প্রচলন হয়। এমনকি দেরহামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কোনো কোনো বর্ণনা মতে, ওই সময়ের বাদশাহ দেরহামের মাধ্যমে লেনদেন বন্ধ করে দিয়ে বৃহদাংকের পয়সা তৈরি করেছিল। পয়সার মাধ্যমে লেনদেন, ওজন এবং গণনা উভয় প্রকারের হতো, পরে অবশ্যই ওজন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গণনার ভিত্তিতে প্রচলন হয়। শরীয়া বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ও পয়সা সংখ্যা হিসেবে।

পয়সা ছামান (বিনিময় মাধ্যম) হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরাম ও ফিকহবিদদের মতামত :

১। ইমাম মুহাম্মদ, মুহাম্মদ ইবনুল ফজল, আল্লামা সারাখছী, আল্লামা হালওয়ানী, মালেকী মাযহাবের ওলামাগণ, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম তাদের মতে পয়সা হলো ছামান।

২। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ তাদের মতে পয়সার জন্য ছামান হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। তা নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হয়। শাফেয়ী মাযহাব মতে পয়সা ছামান নয়।

৩। হাম্বলী মাযহাবের দুটি মত- (ক) পয়সা ছামান এটা তাদের গ্রহণযোগ্য মত। (খ) পয়সা ছামান নয়।

প্রথম গ্রুপের অবস্থান ওই সব বিধান দ্বারা নির্ণিত হয় যা সুদ, সালাম, মুদারাবা, মুশারাকার অধীনে ফুকাহায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন।

সুদসংক্রান্ত আল্লামা কাসানী (রহ.) লিখেন-

ويجوز بيع المعهودات المتقاربة من غير المطعومات بجنسها متفاضلا عند ابى حنفية وابى يوسفؒ بعد ان يكون يدابيد كبيع الفلس بالفلسين باعيانهما وعند محمد لايجوز وجه قوله ان الفلوس اثمان فلا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا كالدراهم والدنانير ودلالة الوصف عبارة عما تقدربه مالية الاعيان ومالية الأعيان كما تقدر بالدراهم والدنانير تقدر بالفلوس فكانت اثمانا ولهذا كانت اثمانا عند مقابلتها بخلاف جسنها وعند مقابلتها بجنسها حالة المساواة وان كانت ثمنا فالثمن لايتعين وان عين كالدراهم والدنانير فالتحق التعين فيهما بالعدم فكان بيع الفلس بالفلسين بغير اعيانهما وذا لا يجوز ولانها اذا كانت اثمانا فالواحد يقابل الواحد فبقى الآخر فضل مال لا يقابله عوض فى عقد المعاوضة وهذا تفسير الربا۔

অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত যেসব বস্তু সংখ্যায় লেনদেন করা যায় ওইগুলোর বেচা-বিক্রি অতিরিক্ততার মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফের নিকট জায়েয। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তা হতে হবে হাতে হাতে যথা–একটা পয়সার বিনিময়ে দুইটা পয়সার বিক্রি জায়েয হবে যখন উভয়টা নির্ধারিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর নিকট তা জায়েয হবে না। তার কারণ হলো, তার মতে পয়সা ছামান সুতরাং দেরহাম-দীনারের মতো সমজাতীয়কে সমজাতীয়ের বিনিময়ে অতিরিক্তসহকারে বিক্রি বৈধ নয়। ছামানিয়্যাতের দলিল হলো এই যে, "যেই জিনিসটা দ্বারা অন্য কোনো পণ্য বা বস্তুর মূল্যমান অনুমান করা যায়।" যেকোনো পণ্য বা বস্তুর মূল্যমান যেমন দেরহাম-দিনার দ্বারা করা যায়। তদ্রূপ পয়সা দ্বারাও করা যায়। সুতরাং পয়সাও ছামান হবে। এ কারণেই যখন পয়সাকে তার সমজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় পণ্যের সাথে বিনিময় করা হয় তখন উভয় দিক সমান হতে হয়, কেননা পয়সা ছামান।

ছামান নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না যেমনটা দেরহাম ও দিনার। সুতরাং তাতে নির্ধারণ পাওয়া যায়নি। ফলে অনির্ধারিত এক পয়সাকে অনির্ধারিত দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় হয়েছে, যা জায়েয নেই এবং এ কারণেও যে পয়সা যেহেতু ছামান। একটা পয়সা একটা পয়সার বিনিময়ে হলো এবং একটা পয়সা বিনিময়হীন রয়ে গেল এটাকেই সুদ বলা হয়। এই মাসআলায় ফতওয়া ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতের ভিত্তিতেই।

মুদারাবা এবং শিরকাত বিষয়ে আল্লামা কাসানী লিখেন-

واما الفلوس فان كانت كاسدة فلايجوز الشركة ولا المضاربة بها لانها عروض وان كانت نافقة فكذلك فى الرواية المشهورة عن ابى حنيفة وابى يوسفؒ وعند محمد تجوز والكلام فيها مبنى على اصل وهو ان الفلوس الرائجة ليست اثمانا على كل حال عند ابى حنيفة وابى يوسفؒ لانها تتعلق بالتعيين فى الجملة وتصير مبيعا باصطلاح العاقدين وعند محمد الثمنية لازمة للفلوس النافقة فكانت من الاثمان المطلقة لهذا ابى جواز البيع الواحد منهما باثنين فتصير رأس مال الشركة كسائر الاثمان المطلقة (بدائع الصنائع ٦/٥٩)

অর্থাৎ পয়সার যদি প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এতে শিরকাত এবং মুদারাবা জায়েয নেই। কেননা তখন ওই পয়সা পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি পয়সার প্রচলন থাকে তখনও ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আবু ইউসুফের মতে এতে শিরকাত জায়েয হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে জায়েয হবে। পয়সাসংক্রান্ত উক্ত আলোচনা একটি মূলনীতিনির্ভর। তা হলো (فلوس) (প্রচলিত পয়সা সর্বাবস্থায় ছামান (رائجة না। কেননা সেটা কোনো না কোনো পর্যায়ে নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়। ক্রেতা-বিক্রেতার পরিভাষা দ্বারা তা 'মবী' Subject Metter ও হতে পারে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে উক্ত প্রকারের পয়সার ক্ষেত্রে ছামান হওয়া আবশ্যকীয়। সুতরাং পয়সা সাধারণ ছামানের অন্তর্ভুক্ত। তাই তার মতে একটা পয়সাকে দুইটি পয়সার বিনিময়ে বিক্রি জায়েয হবে না। সুতরাং শিরকাতের মধ্যে পয়সা অন্যান্য ছামানের মতো Capital হতে পারবে। উল্লেখ্য, শিরকাত, মুদারাবার মধ্যে শরঈ নীতিমালা হলো উভয় প্রকারের আকদের মধ্যে Capital নগদ হতে হবে। কোনো পণ্যদ্রব্য উভয় আকদের Capital হতে পারে না। উক্ত মূলনীতির আলোকে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে পয়সার মাধ্যমে শিরকাত ও মুদারাবা জায়েয হবে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের মতে জায়েয হবে না।

ছালাম বিষয়ে আল্লামা কাসানী (রহ.) লিখেন-

واما السلم فى الفلوس عدد افجائز عند ابى حنيفة وابى يوسفؒ وعند محمد لايجوز بناء على ان الفلوس اثمان عنده فلا يجوز السلم فيها كما لايجوز السلم فى الدراهم والدنانير الخ

অর্থাৎ পয়সার মধ্যে ছালাম সংখ্যার হিসাবে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে জায়েয। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মতে জায়েয নেই। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) পয়সাকে ছামান সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এতে ছালাম জায়েয হবে না যদ্রূপ দেরহাম-দিনারের মধ্যে ছালাম জায়েয নেই।

উপরোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ :

সুদ, মুশারাকা, মুদারাবা এবং ছালামসংক্রান্ত আলোকপাতকৃত আলোচনার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে পয়সা ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে সাধারণ ছামান এবং ছামানিয়্যাত বিশেষ্য তার জন্য আবশ্যকীয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে পয়সা সাধারণ ছামানের অন্তর্ভুক্ত নয়। ছামানিয়্যাত বিশেষ্য তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

এ বিষয়ে মুহাম্মদ ইবনুল ফজল, আল্লামা সারাখছী ও আল্লামা হালওয়ানীর অবস্থান। এ সম্পর্কে আল্লামা আল জাঈদ লিখেন-

ويوافق محمد بن الحسن على هذا الاصل بعض علماء الحنفية مثل محمد بن الفضل واختاره السرخسى وشيخه الحلوانى (احكام الاوراق النقدية والتجارية ٣٩)

অর্থাৎ উক্ত মূলনীতিতে হানাফী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে আল্লামা মুহাম্মদ বিন আল ফজল, আল্লামা সারাখসী ও তার শেখ আল্লামা হালওয়ানী। ইমাম মুহাম্মদের সাথে একাত্মতা পোষণ করেছেন।

মালেকী মাযহাবের ইমামদের মত :

তাদের মতেও পয়সা ছামান তবে এক পয়সাকে দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করার বিষয়ে তাদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। যথা-(ক) এ ধরনের লেনদেন হারাম। (খ) মাকরুহ। (গ) হালাল। তবে তাদের প্রথমোক্ত মতটাই গ্রহণযোগ্য যথা জাস্টিস আল্লামা মুফতী তকী উসমানী লিখেন-

وذلك ان بيع الفلس بالفلسين حرام مطلقا وهو من الربا المحرم شرعا عند الامام مالك بن انس ومحمد بن الحسن الشيبانى (احكام الاوراق

المحتاج شرح المنهاج ٢/٢٤)
অর্থাৎ স্বর্ণ-রুপার মধ্যে সুদের ইল্লাত হলো ছামানিয়্যাত বিশেষ্য থাকা, যা অন্য পণ্যদ্রব্য ও পয়সার মধ্যে নেই।
আল্লামা নববী (রহ.) লিখেন-
اذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور (المجموع شرح المهذب)
অর্থাৎ যদি পয়সার মধ্যে মুদ্রার মতো লেনদেনও শুরু হয়ে যায় তার পরও এর মধ্যে সুদ হারাম হবে না। এটাই যথার্থ। এটাকেই লেখক দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই জমহুরের মত।
উল্লেখ্য, আরবের লেখকরা যদিও স্পষ্ট করে লেখেছেন যে শাফেয়ী মাযহাবে পয়সা ছামান নয় এবং আল্লামা কূহাজী (রহ.)-এর লেখাতেও তা ফুটে উঠেছে। তবে শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের লেখার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে বোঝা যায় যে তারা পয়সার মধ্যে সাধারণ ছামানিয়্যতের অস্বীকার করেননি বরং মৌলিক ছামানিয়্যাতকে অস্বীকার করেছেন অর্থাৎ পয়সা প্রকৃতিগত ছামান নয় । তাদের মতে যেহেতু সুদ হারাম হওয়ার ইল্লাত মৌলিক ও প্রকৃতিগত ছামানিয়্যাত। পয়সার মধ্যে তা অনুপস্থিত। তাই তারা এক পয়সাকে দুই পয়সার বিনিময়ে জায়েয বলেছেন।
এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এক পয়সাকে দুই পয়সার বিনিময়ে জায়েয হওয়ার কারণ ছামান না হওয়া নয়। বরং প্রকৃতিগত ছামানিয়্যতের ইল্লাত না থাকা।
যেমনটা আল্লামা নববী লেখেন-
وقال الجمهور العلة فيها صلاحية الثمنية الغالبة وان شئت قلت جوهرية الاثمان غالبا وفى تعدى الحكم الى اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم ولو جعلت ثمنا واحدا لايزداد ولا ينقص بل تقوم به الاشياء ولا تقوم هى بغيرها لصلح امر الناس-(اعلام الموقعين ١٣٩/٢)
অর্থাৎ আমি যেভাবে মানুষের লেনদেনের বিকৃতি ও তাদের ক্ষতি হতে দেখেছি আর তা হয়েছে পয়সাকে সাধারণ পণ্য ও লাভার্জনের মাধ্যম বানানোর কারণে। ফলে তাদের ক্ষতি ব্যাপকতর হয়ে গেছে। অন্যায় বেড়ে গেছে।
যদি পয়সাকে পণ্য না বানিয়ে ছামান বানাত এবং এর মধ্যে উত্থান-পতন না হতো। বরং পয়সা দ্বারা অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনুমান করা হতো। অন্য পণ্যদ্রব্য দ্বারা পয়সার মূল্যের অনুমান করা না হতো তাহলে জনসাধারণের লেনদেন যথাযথ থাকত।
উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম :
আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) পয়সাকে ছামান বলে স্বীকৃতি দেন এবং বলেন যে পয়সাকে ছামান স্বীকৃতি না দেওয়াতেই জনসাধারণের ব্যাপক ক্ষতি ও অন্যায়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে।
এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের অবস্থান :
অর্থাৎ দ্বিতীয় গ্রুপের মতে পয়সার মধ্যে ছামানিয়্যাত বিশেষ্য অনিবার্য নয় এবং পয়সা নির্ধারণ করার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে যায়। সুতরাং ইমাম মুহাম্মদের মতানুসারে সেসব বিধান পয়সার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এদের মতে তার সম্পূর্ণ বিপরীত হবে।
ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অবস্থান :
তাদের মাযহাবে ও পয়সা ছামান নয়।
যেমনটা আল্লামা কূহাজী (রহ.) লিখেন-
وعلة الربا فى الذهب والفضة الثمنية وهى منتفية عن العروض والفلوس (زاد النقدية للعثمانى ١٧)
অর্থাৎ এটা এজন্য যে এক পয়সাকে দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রি হারাম। ইমাম মালেক ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে এ ধরনের লেনদেন সুদ। হারাম।
আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যার অবস্থান-
الاظهر المنع من ذلك فان الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الاثمان وتجعل معيارا لاموال الناس (مجموعة الفتاوى ٤٧١/٢٩)
অর্থাৎ সাধারণত উক্ত প্রচারের লেনদেন নিষিদ্ধ। কেননা 'ফুলূসে নাফেকা' প্রচলিত পয়সার ওপর ছামানের বিধানই প্রযোজ্য এবং পয়সাকে মানুষের সম্পদের মানদণ্ড বলা হয়।
তিনি আরো লিখেন-
فاذا صارت الفلوس اثمانا صارفيها هذا المعنى فلا يباع ثمن بثمن الى اجل (مجموعة الفتاوى ٤٧١/٢٩)
অর্থাৎ পয়সা যেহেতু ছামান সুতরাং এর মধ্যে ছামানিয়্যাত বিশেষ্য এসে গেছে তাই ছামানকে ছামানের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করা যাবে না।
উপরোক্ত বক্তব্যের সারমর্ম। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যার মতে ও পয়সা ছামান।
আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের অবস্থান :
তিনি লিখেন-
والثمن هو المعيار الذى به يعرف تقويم الاموال فيجب ان يكون محددا مضبوطا لايرتفع ولا ينخفض (اعلام الموقعين ١٣٩/٢)
অর্থাৎ ছামান হলো ওই মানদণ্ড, যার মাধ্যমে সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং ছামানের সীমানা নির্ধারিত থাকা জরুরি। যাতে এর মধ্যে উত্থান-পতন না হয়।
তিনি আরো লিখেন-
كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر

الفلوس اذا رجت وجه والصحيح انه لاربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة (روضة الطالبين للنووى)

অর্থাৎ জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, স্বর্ণ এবং রুপাতে সুদের ইল্লাত হলো প্রকৃতিগত ছামান হওয়া। আপনি যদি চান বলতেও পারেন যে পয়সার মধ্যেও প্রকৃতিগত ছামান ও সুদের বিধানের একটা মত পাওয়া যায়। তবে সহীহ হলো এর মধ্যে সুদ নেই। কেননা পয়সার মধ্যে প্রকৃতিগত ছামানিয়্যত বিশেষ্য অনুপস্থিত।

হাম্বলী মাযহাবের অবস্থান :

এ বিষয়ে তাদের দুটি মত পাওয়া যায়। (১) পয়সা ছামান নয়। (২) পয়সা ছামান এ মতটাই তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত। তাই এই মতানুসারে তাদের মাযহাবে ও এক পয়সাকে দুই পয়সার বিনিময়ে বেচাকেনা নাজায়েয।

كمافى المغنى مع الشرح الكبير لايباع الفلس بالفلسين (١٢٨/٤)

সারমর্ম, জমহুর ফুকাহা, মুজতাহিদীনদের মতে পয়সা ছামান এবং পয়সাকে পয়সার বিনিময়ে কমবেশ করে লেনদেন নাজায়েয এবং হারাম।

এ বিষয়ে উপরোক্ত আলোচনার আলোকে গ্রহণযোগ্য মত এই যে,

১। পয়সা ছামান Price

২। তা নির্ধারণে নির্ধারিত হয় না।

৩। কমবেশ করে এগুলোর বেচাবিক্রি হারাম

৪। পয়সার মধ্যে আকদে শিরকত বৈধ।

৫। পয়সার মধ্যে আকদে মুদারাবা বৈধ।

৬। পয়সার মধ্যে ছালাম অবৈধ।

উপর্যুক্ত মতের গ্রহণযোগ্যতার কারণ :

প্রচলিত পয়সার মধ্যে স্বর্ণ ও রুপার মতো লেনদেন বিদ্যমান এবং স্বর্ণ-রুপার যেই সব ভূমিকা ও কার্যকরিতা রয়েছে তা পয়সাতেও বেশ উত্তমরূপে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। মুদ্রার সংজ্ঞা পরিপূর্ণভাবে পয়সার ওপরও প্রযোজ্য হয়। তাই পয়সাকে ছামান বলাটাই যৌক্তিক এবং এর সাথে ওই সব মু'আমালা করা হবে, যা করা হয়ে থাকে স্বর্ণ-রুপার সাথে।

এ কারণেই উম্মতের জমহুর ওলামায়ে কেরাম পয়সার মধ্যে ছামানিয়্যতের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকেন। যথা ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, আল্লামা সারাখসী, আল্লামা হালওয়ানী, আল্লামা মুহাম্মদ ইবনুল ফজল, আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা, আল্লামা ইবনুল কায়্যিমসহ আরো অনেকে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

সারা বিশ্বে একই দিনে রমাজানের রোযা আরম্ভ ও ঈদ উদ্‌যাপন : একটি পর্যালোচনা

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

সমগ্র বিশ্বের মুসলমান তাদের নিজস্ব অঞ্চলে চাঁদ দেখে রমাজানের রোযা শুরু করে, এরই ভিত্তিতে তারা ঈদ উদ্‌যাপন করে। ইসলামের শুরুলগ্ন থেকে এভাবেই রোযা ও ঈদ পালিত হয়ে আসছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কিছু লোক এর ব্যতিক্রম পথে এগোচ্ছে। বিশেষত আমাদের বাংলাদেশের একটি বিচ্ছিন্ন জামা'আত সারা বিশ্বে একই দিনে রোযার সূচনা ও ঈদ উদ্‌যাপনের আন্দোলনে মেতে উঠেছে। সৌদি আরবে চাঁদ দেখাকেই তারা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য যথেষ্ট মনে করে। তাই সৌদি আরবে চাঁদ দেখাকে কেন্দ্র করে তারা আরববাসীদের সঙ্গে একই দিনে রোযা শুরু করে এবং সৌদি আরবে যেদিন ঈদ হয়, তারাও সেদিন ঈদ উদ্‌যাপন করে থাকে। কয়েক দশকে তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে এই মতবাদ অনেক রহস্যজনকভাবে প্রসার লাভ করে চলেছে, ফলে সাধারণ জনগণ বিব্রত পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। তাই অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের খেদমতে শরীয়তের সঠিক তথ্যসহকারে বিষয়টি পর্যালোচনার প্রয়োজন মনে করছি।

সমগ্র বিশ্বের বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি যদি আমরা তাকাই, তাহলে লক্ষ করতে পারব, চিহ্নিত কিছু লোক ব্যতীত তামাম বিশ্বের সব মুসলমানই তাদের স্ব স্ব দেশে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে রোযা পালন করছে, ঈদ উদ্‌যাপন করছে। উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরাম বাস্তব ক্ষেত্রে সবাই এতে একমত। কারণ হিসেবে এ অবস্থার সমর্থনে রয়েছে কুরআন, হাদীস ও ভূগোল তাত্ত্বিক অসংখ্য যুক্তিপূর্ণ তথ্য-প্রমাণ। এ পরিসরে আমরা আংশিক আলোকপাতের প্রয়াস পাব।

১. কুরআনে কারীমের দিকনির্দেশনা

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন,

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমাজান মাসটি পাবে, সে অবশ্যই এই মাসে রোযা রাখবে।" (বাক্বারা-১৮৫)

তাফসীর বিশারদগণের মতে, 'যে ব্যক্তি রমাজান মাসটি পাবে' বলে 'যে ব্যক্তি চাঁদ দেখবে' বোঝানো হয়েছে। অতএব যে বা যারা নিজে সরাসরি রমাজানের চাঁদ দেখতে সক্ষম হবে, তার ওপর ওই মাস রোযা রাখা ফরয। এতে কোনো মতানৈক্য নেই। তবে যে নিজে চাঁদ দেখেনি, কিন্তু তার নিকট চাঁদ উদয় হওয়ার সংবাদ পৌঁছেছে, এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের মতানুসারে বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যে স্থান থেকে চাঁদ দেখার সংবাদ এসেছে এবং যে স্থানে সংবাদ পৌঁছেছে সর্বত্র যদি একই সময়ে চাঁদ দেখা ভৌগোলিকভাবে সম্ভব হয় এবং বিগত বছরসমূহে একই সময়ে এতে চাঁদ দেখা যাওয়ার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। তাহলে ওই সব স্থানের সবাইকে অবশ্যই রোযার চাঁদ দেখার শরীয়তসম্মত খবর জেনে রোযা আর ঈদের চাঁদ দেখার খবর জেনে ঈদ উদ্‌যাপন করতে হবে, যদিও এমন লোকের সংখ্যা অনেক হয় যারা নিজে স্বচক্ষে চাঁদ প্রত্যক্ষ করেনি। তবুও তারা রোযা রাখা বা ঈদ করতে বাধ্য থাকবে। তবে যেসব স্থানে একই দিনে চাঁদ উদয় হয় না, বা ভৌগোলিক কারণে একই দিনে চাঁদ উদয় হওয়া সম্ভবও নয়, এ ধরনের এক স্থানে চাঁদ দেখার খবর অন্যত্র পৌঁছলে, যাদের কাছে খবর পৌঁছেছে তারা এই খবরের ওপর ভিত্তি করে রোযা বা ঈদ পালন করবে না। বরং যে এরিয়া পর্যন্ত একই দিনে চাঁদ দেখা সম্ভব তারাই শুধু এর ওপর ভিত্তি করবে। আল কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের আলোকে তারাই রমাজান মাস পেয়েছে বা চাঁদ দেখেছে। (আহকামুল কুরআন জাসসাস ১/১৪৯, আহকামুল কুরআন ইবনে আরাবী ১/১২০)

বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) লিখেন,

والأشبه من حيث الدليل، هو الاعتبار باختلافها، كما فى دخول وقت الصلاة، لأن السبب شهود الشهر....

দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ মত হলো, উদয়স্থান ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ফলে উদয়ের সময় ভিন্ন

عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فقال قدمت فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر فسألنى عبد الله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم: ورأه الناس وصاموا و صام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلثين او نراه فقلت ألا تكفى برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ (مسلم ٢/٧٦٥ (١٠٨٧)

"কুরাইব বলেন, উম্মে ফযল বিনতে হারেস তাকে সিরিয়ার গভর্নর সাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর নিকট পাঠালেন, কুরাইব আরো বলেন, আমি সিরিয়ায় গিয়ে তার দায়িত্ব পালন করি। সিরিয়ায় রমাজানের চাঁদ দেখা গেল, আমি তখন সিরিয়ায়। আমরা শুক্রবার রাতে চাঁদ দেখলাম। রমাজানের শেষ দিকে আমি মদীনায় পৌঁছি। ইবনে আব্বাস (রা.) আমাকে চাঁদ দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। বললেন, তোমরা কখন চাঁদ দেখেছ? আমি বলি, আমরা শুক্রবার দিবাগত রাতে চাঁদ দেখেছি। তিনি প্রশ্ন করেন, তুমি নিজে দেখেছ? আমি বলি, হ্যাঁ! আমি নিজে দেখেছি এবং লোকজনও দেখেছে। আর সবাই রোযা রেখেছে এবং মু'আবিয়া (রা.)ও রোযা রেখেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমরা একদিন পর শনিবার দিবাগত রাতে চাঁদ দেখেছি, অতএব আমরা আমাদের হিসাব মতে পূর্ণ ৩০ দিন রোযা রেখে যাব অথবা চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করব।

কুরাইব বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, حكماـ

"চাঁদ দেখে রোযা রাখবে, তবে একটি শতসিদ্ধ কথা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে চাঁদ দেখতে হবে, তা বলা হয়নি; বরং যেসব অঞ্চলে একই সময়ে চাঁদ দেখা সম্ভব ওই সব অঞ্চলের কেউ চাঁদ দেখলে ওই অঞ্চলের অন্যরা এর ওপর নির্ভর করে আমল করবে। আর যেসব অঞ্চলে চাঁদ উদয়ের সময় এক হয় না, বরং প্রতিটি অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বা আগে-পরে চাঁদ উদয় হয়ে থাকে ওই সব অঞ্চলের কোথাও চাঁদ দেখে থাকলে অন্য কোনো অঞ্চলে চাঁদ দেখেছে বা দেখার আদৌ সম্ভাবনা আছে কিছুই বলা যাবে না।" (ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে বালাদিল হারাম ২৮৫)

২. হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট বর্ণনা :

হাদীস শরীফে একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর সময়ে শাম বা বর্তমান সিরিয়াবাসী শুক্রবার দিবাগত রাতে চাঁদ দেখে শনিবার থেকে রোযা পালন করে। আর একই সময়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)সহ মদীনাবাসী শনিবার দিবাগত রাত চাঁদ দেখে রবিবার থেকে রোযা শুরু করে। সিরিয়ায় এক দিন পূর্বে চাঁদ দেখার বিষয়টা ইবনে আব্বাস (রা.) অবগত হওয়ার পরেও এর প্রতি নির্ভর না করে মদীনায় চাঁদ দেখে বা ৩০ দিন রোযা পূর্ণ করে ঈদ উদ্‌যাপনের মতামত ব্যক্ত করেন। আর তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এমন নির্দেশনাই পেয়েছি। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়, কোনো এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে অন্য দেশবাসীর ওপর রোযা বা ঈদ পালন করার কোনো উপায় নেই। হাদীসটির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

হলে তা ভিন্ন ভিন্নভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে, যেভাবে নামাযের সময়ের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। কেননা রোযা রাখা ফরয হওয়ার মূল কারণ হলো, রমাজান মাস প্রমাণিত হওয়া। তাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চাঁদ উদয় হয় এমন দুই দেশের কোনো এক দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে অপর দেশবাসীর ওপর রোযা ফরয হবে না। যেমন–কোনো দেশে যদি সূর্য হেলে পড়ে বা অস্ত যায়, কিন্তু অন্য আরেকটি দেশে হেলে পড়েনি বা অস্ত যায়নি, এমতাবস্থায় যে দেশে সূর্য হেলে পড়েছে বা অস্ত হয়েছে তাদের ওপর যোহর বা মাগরিবের নামায ফরয হবে, পক্ষান্তরে অন্য দেশবাসীদের ওপর যোহর বা মাগরিব ফরয হবে না। কেননা, তাদের ওপর নামায ফরয হওয়ার মূল কারণ তথা নামাযের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হয়নি। (শরহুন নিকায়াহ ১/৪১২)

প্রখ্যাত তাফসীর বিশারদ ইবনুল আরাবী (রহ.) উপরোল্লিখিত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লিখেন,

"যদি কেউ এক স্থানে চাঁদ দেখেছে বলে সংবাদ পরিবেশন করে, তাহলে ওই স্থানটির নিকটবর্তী বা একই সাথে চাঁদ দেখার মতো সম্ভাব্য স্থান হলে উভয় স্থানে একই বিধান গণ্য হবে। এমন না হলে অধিকাংশের মতে প্রত্যেক দেশের মুসলমান তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমল করবে।" (আহকামুল কুরআন ১/১২০)

আরব দেশের নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার কিতাব, ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে বালাদিল হারাম"-এ উল্লেখ করা হয়েছে,

ومن المعلوم أنه لا يراد بذالك رؤية كل إنسان بمفرده، فيعمل به فى المكان الذى رؤى فيه، وفى كل مكان يوافقهم فى مطلع الهلال أما من لم يوافقهم فى مطلع الهلال، فإنه لم يره لا حقيقة ولا

মু'আবিয়া (রা.) যে এক দিন পূর্বে চাঁদ দেখলেন ও রোযা শুরু করলেন তা যথেষ্ট নয়? তিনি উত্তরে বললেন, সিরিয়ার চাঁদ দেখা মদীনাবাসীদের জন্য যথেষ্ট নয়। এভাবেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নির্দেশ করেছেন। (সহীহ মুসলিম হা. ১০৮৭, নাসাঈ হা. ২১১০, আবু দাউদ হা. ২৩৩২, তিরমিযী হা. ৬৯৩)

আরব বিশ্বের প্রখ্যাত গবেষক ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী উপরোক্ত হাদীস প্রসঙ্গে লিখেন,

فدل على أن ابن عباسؓ لم يأخذ برؤية أهل الشام، وإنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر।

উপরোক্ত বর্ণনাটি প্রমাণ করে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখার বিষয়টা মদীনাবাসীদের জন্য চাঁদ দেখার দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। এতে প্রমাণ হয়, এক দেশে চাঁদ দেখা যাওয়া অন্য দেশের জন্য যথেষ্ট হবে না। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬০৮)

ইবনে রুশদ মালেকী (রহ.) লিখেন,

فظاهر هذا الأثر يقتضى أن لكل بلد رؤية।

"এই হাদীসের প্রত্যক্ষ দাবি, প্রত্যেক দেশে ভিন্ন ভিন্নভাবে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হতে হবে।" (মা'আরিফুস সুনান ৫/৩৩৯)

ইমাম তিরমিযী (রহ.) এই হাদীসটি সম্পর্কে বলেন,

حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم, إن لكل أهل بلد رؤيتهم।

"ইবনে আব্বাসের (রা.) এই হাদীসটি বিশুদ্ধ। বিজ্ঞ আলেমগণের আমল এই হাদীসের মর্মানুসারেই যে, প্রত্যেক দেশের অধিবাসীগণ তাদের নিজস্ব চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমল করবে।" (তিরমিযী ৩/৭৭)

আবু দাউদের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আওনুল মা'বুদের" ভাষ্য নিম্নরূপ

যারা এক দেশের চাঁদ দেখাকে অন্য দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য মনে করে না, তারা এই হাদীসটিকে তাদের পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করে। আর তা এভাবে যে, ইবনে আব্বাস (রা.) সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে কোনো আমল করেননি। আর এই হাদীসের শেষে তিনি বলেন, এভাবেই আমাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ করেছেন। তার এই উক্তিটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তিনি স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে অবহিত হয়েছেন যে, এক দেশে চাঁদ দেখার কারণে অন্য দেশবাসীদের ওপর সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক হবে না।" (আওনুল মা'বুদ ৬/২২৫)

হানাফী মাযহাবের অন্যতম আইন বিশারদ, আল্লামা ইবনে হুমাম (রহ.) অতি সংক্ষেপে ও অত্যন্ত চমৎকার একটি বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। তিনি লিখেন,

ولا شك أن هذا –حديث كريب– أولى، لأنه نص، وذلك حديث صوموا لرؤيته ....محتمل لكون المراد।

"কুরাইব থেকে বর্ণিত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসটি উল্লিখিত বিষয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। কেননা এক দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে অন্য দেশে এর ওপর ভিত্তি করে আমল করা হবে কি না এ বিষয়ে হাদীসটি একেবারেই সুস্পষ্ট। 'এ ছাড়া চাঁদ দেখে রোযা রাখো।' এ-জাতীয় যাবতীয় হাদীস ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ও অস্পষ্ট। (ফাতহুল কাদীর ২/৩১৯)

বলাবাহুল্য, উল্লিখিত হাদীসের বিশ্লেষণে অসংখ্য উক্তি রয়েছে। তবে ইবনে হুমাম (রহ.)-এর উল্লিখিত উক্তিটি আলোচ্য বিষয়ে সারমর্মের স্থান অধিকার করে। কেননা আলোচ্য বিষয়ে বেশ কয়েকটি হাদীস রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীসই আলোচ্য বিষয়ে অস্পষ্ট বা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। তাই সবাই নিজস্ব ব্যাখ্যার আলোকে হাদীসগুলোকে স্ব স্ব বক্তব্যের পক্ষে উপস্থাপনের চেষ্টা করে থাকে। এমনকি এ পর্বের শুরুতে উল্লিখিত কুরআনে কারীমের আয়াত প্রসঙ্গেও এ ধরনের আচরণ হতে দেখা যায়। তবে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উল্লিখিত হাদীসটি আলোচ্য বিষয়ে একেবারেই সুস্পষ্ট। এতে সিরিয়ায় চাঁদ দেখাকে মদীনাবাসীদের জন্য যথেষ্ট নয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই কোনো এক দেশে চাঁদ দেখা গেলেও যেসব দেশ চাঁদ উদয়ের ক্ষেত্রে এ দেশের সঙ্গে মিল নেই, ওই সব দেশে তা কার্যকরী বলে গণ্য হবে না। এ ছাড়া এ হাদীসটি মুসলিম শরীফসহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহ.) এই হাদীসটিকে সহীহ-বিশুদ্ধ বলে উল্লেখও করেছেন। তাই এই একটিমাত্র হাদীসই আলোচ্য বিষয়ে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। তার পরও আর মাত্র একটি হাদীস উল্লেখ করেই এ পর্বের ইতি টানব।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

"তোমরা চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে ঈদ উদ্‌যাপন করো।" (বুখারী হা. ১৯০৯, মুসলিম হা. ১৯ ও ১০৮১)

এ হাদীসের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আরব দেশের নির্ভরযোগ্য ফাতওয়ার কিতাব ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে বালাদিল হারাম' নামক গ্রন্থে লিখেছে "কুরআনুল কারীমের আয়াত 'তোমাদের মধ্যে যে রমাজান পাবে সে যেন রোযা রাখে' এর ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে, এই হাদীসের ব্যাপারেও আমরা তাই বলব। যে দু'টি দেশে চাঁদ উদয়ের সময়ে মিল নেই বরং দু'টি দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চাঁদ উদয় হয়, এমন দু'টি দেশের একটিতে চাঁদ দেখা গেলেও বলতে হবে অন্য দেশটিতে চাঁদ উদয় হয়নি। প্রত্যক্ষভাবে তো চাঁদ দেখা যায়নি, আর ভৌগোলিকভাবে একই সময়ে উদয়ের সম্ভাবনা না থাকার ফলে বলতে হবে পরোক্ষভাবেও চাঁদ দেখা যায়নি। (ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে বালাদিল হারাম ২৮৫)

উল্লেখ্য যে, সৌদি আরবে বাংলাদেশ অপেক্ষা এক বা দুই দিন পূর্বেই নিয়মিত চাঁদ উদয় হয়ে থাকে। যেদিন সৌদি আরবে কেউ স্বচক্ষে রমাজানের চাঁদ দেখবে তার ওপর উল্লিখিত হাদীসের আলোকে রোযা রাখা ফরয হবে। কারণ সে প্রত্যক্ষভাবে চাঁদ দেখেছে। আর কুরআনের ভাষায় সে রমাজানও পেয়েছে। তবে সৌদি আরবে অবস্থান করেও যে ব্যক্তি চাঁদ দেখতে সক্ষম হয়নি তাকেও রোযা পালন করতে হবে। কেননা সে এমন স্থানে অবস্থান করছিল, যেখানে চাঁদ দেখা সম্ভব বা চাঁদ উদয় হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই সে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে সক্ষম না হলেও শরীয়তের হুকুম হিসেবে বা পরোক্ষভাবে সে চাঁদ দেখেছে। তাই তার ওপরও রোযা ফরয।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঠিক ওই সময়ে বাংলাদেশে রয়েছে, সে তো প্রত্যক্ষভাবে চাঁদ দেখেনি এবং এমন স্থানে অবস্থান করছে যেখানে চাঁদ দেখাও অসম্ভব বা এখানে চাঁদ উদয়ই হয়নি, তাই সে শরীয়তের হুকুম হিসেবে বা পরোক্ষভাবেও চাঁদ দেখেনি। অতএব তার ওপর রোযাও ফরয হবে না।

মোটকথা, সৌদি আরব ও বাংলাদেশে ভৌগোলিকভাবে চাঁদ উদয়ের সময় ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে সৌদি আরবে চাঁদ দেখা গেলেও বাংলাদেশে চাঁদ উদয় হয়েছে বা বাংলাদেশের মানুষ চাঁদ দেখেছে বলে গণ্য করা যাবে না। একই কারণে সৌদি আরবে চাঁদ দেখা গেলেও বাংলাদেশের মানুষের ওপর রোযা পালন বা তাদের জন্য ঈদ উদ্‌যাপন কিছুই অর্পিত হবে না।

৩. সময়ের ওপর নির্ভর ইবাদতসমূহের সার্বিক অবস্থান :

রমাজানের রোযা ও দু'টি ঈদ পালন করা সময়নির্ভর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। নির্দিষ্ট সময় প্রমাণিত হলে এই ইবাদতগুলো আদায় করতে হয়, অন্য সময়ে পালন করলে মোটেও তা আদায় হবে না। এভাবে ফরয নামায, ইফতার, সাহরী, ঈদের নামায ও কুরবানী করা একই প্রক্রিয়ায় সময়নির্ভর ইবাদত। বাংলাদেশে যখন ফজর, মাগরিব বা যে কোনো নামাযের সময় হয় তখন সৌদি আরবে তা আদায় করার সময় বলে মোটেও প্রযোজ্য হয় না। আমাদের ইফতারের সময়ে তারা ইফতার করলে তাদের রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনকি আমাদের ঈদের নামাযের সময়ে তাদের ঈদের নামাযটাও আদায় করা প্রায় অসম্ভব। এ ছাড়া আমরা যখন ঈদের নামায আদায় করি ওই সময়ে অনেক দেশে রাত শুরু হয় মাত্র। এসব ইবাদতই সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেক দেশে আপন আপন দেশের সময় অনুযায়ী পালন করা হয়। এসব ইবাদতের ক্ষেত্রে সময়ের তারতম্য বিনা বাক্যে সবাই মেনে যাচ্ছে। তাই সময়নির্ভর কোনো ইবাদতকেই ভিন্নভাবে দেখার উপায় নেই। নামায, রোযা, ইফতার, সাহরী, ঈদ ও কুরবানী সবই পালন করতে হবে স্ব স্ব দেশে তা ফরয হওয়ার শরীয়তসম্মত কারণ বা যথাযথ সময় প্রমাণিত হলে। আর রোযা, ঈদ ও কুরবানী আবশ্যক হওয়ার শরীয়তসম্মত কারণ বা যথাযথ সময় প্রমাণিত হবে চাঁদ উদয়ের মাধ্যমে। সুতরাং যে দেশে যখন এই কারণ প্রমাণিত হবে, তখনই তাদের জন্য রোযা, ঈদ ও কুরবানী আদায়ের প্রযোজ্য সময় বলে বিবেচিত হবে। সৌদি আরবের প্রখ্যাত গবেষক ড. যুহাইলী এ বিষয়টা অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে গিয়ে লিখেন,

وهو قياس اختلاف مطالع القمر على مطالع الشمس المنوط به اختلاف مواقيت الصلاة

স্থানের ব্যবধানের কারণে সূর্যোদয়ে যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, চাঁদ উদয়ের ক্ষেত্রেও এমন হওয়া একটি যুক্তিসংগত বিষয়। সূর্যোদয়ের ব্যবধানের কারণে নামাযের সময় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের হয়। তাই চাঁদ উদয়ের সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত রোযা ও ঈদের ক্ষেত্রেও এমনটাই গ্রহণযোগ্য হবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ২৬০৮)

৪. রোযা ও ঈদ পালনে ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব :

পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে আলোচ্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা অনেক সহজ। বিশ্ব সময় আবর্তন মূলত সূর্য ও চন্দ্রকেন্দ্রিক। সূর্যোদয়ের মাধ্যমে দিনের প্রারম্ভ আর তা অস্তের ফলে দিনের

পরিসমাপ্তি হয়ে রাতের আগমন ঘটে। বিজ্ঞানের উন্নতি ও ভূগোল শাস্ত্রের অবদানে আজ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীটা গোলাকার। তা নিজ কক্ষপথে ঘোরার সাথে সাথে একটি নির্দিষ্ট গতিতে সূর্যের চারদিক অতিক্রম করে। ফলে পৃথিবীর যে স্থানে যখন সূর্যের আলো পৌঁছে ওই স্থানে দিন আর অপর প্রান্তে রাত হয়। তাই পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত একই সময়ে হয় না, তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই বরং সর্বজনস্বীকৃত একটি বিষয়মাত্র। এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর এক প্রান্তে, যথা বাংলাদেশের ঘড়ির কাঁটায় দুপুর ১২টা হলে অপর প্রান্তে তথা আমেরিকায় রাত ১২টা হয়। সুতরাং কোনো দেশে সূর্যাস্তের পর যখন ওই দেশের মুসলমানগণ মাগরিবের নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, নামায আদায় করছেন, ঠিক ওই মুহূর্তে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তখন ফজরের সময় আগত। এখানে প্রশ্ন হলো, যারা বলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চাঁদ উদয় হওয়া গ্রহণযোগ্য নয় বরং পৃথিবীর যেকোনো স্থানে চাঁদ উদয় হলেই সর্বত্র রোযা পালন করতে হবে। তারা কি পৃথিবীর যেকোনো স্থানে সূর্য অস্ত গেলে সারা বিশ্বের মুসলমানের ওপর তখনই মাগরিবের নামায ফরয এ কথা বলবেন? না! এমন তো কেউই বলেন না বরং সবাই একমত, যার যার দেশের সময় হিসেবে নামায আদায় করবে। ঠিক রোযা ও ঈদের মাসআলাটিও এভাবেই বিশ্লেষণযোগ্য। যখন যে দেশে চাঁদ উদয় হবে, তখন ওই দেশের অধিবাসীদের ওপর রোযা ফরয হবে এবং এভাবেই ঈদ উদ্‌যাপন করবে। এ ছাড়া বাংলাদেশে যখন ঈদ উদ্‌যাপন করে ওই সময়ে আমেরিকাতে তো মাত্র রাত শুরু হয়। তাই আমাদের সাথে তাদের ঈদ করার বা রোযা শুরু করার তো কোনো উপায়ই নেই।

বাস্তব অবস্থা :

এ পরিসরে একটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে, পৃথিবীর পূর্বের দেশের তুলনায় পশ্চিমের দেশে ভৌগোলিক কারণেই চাঁদ অপেক্ষাকৃত প্রথমে দেখা যায়। তাই পশ্চিমা কোনো দেশে চাঁদ উদয় হলে পূর্বের দেশসমূহে চাঁদ উদয় হবে এমনটা নিশ্চিত নয়; বরং এ ক্ষেত্রে চাঁদ উদয়ের ব্যবধানটা প্রকাশ পাবে। তবে পূর্ব দেশে চাঁদ উদয় হলে ভৌগোলিক কারণেই পশ্চিমা দেশসমূহে চাঁদ উদয় হওয়া নিশ্চিত। কেননা চাঁদ পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তেই প্রথমে উদিত হয়। (আত তাহকীক ফী আহাদীসিল খিলাফ ২/৮২, তুহফাতুল আলমায়ী ৩/৬৪)

সংশয় ও নিরসন :

কুরআনে কারীমে চাঁদবিষয়ক আয়াত ও কিছু হাদীসের ব্যাপকতা এবং ফিক্বহী গ্রন্থের একটি বাহ্যিক উদ্ধৃতিকে ভিত্তি করে কেউ কেউ সাধারণ জনমনে সংশয় সৃষ্টি করে থাকে। এসব সংশয়ের অবসান হিসেবে বিস্তারিত লেখার দাবি রাখে। তবে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে যা না লেখলেই নয়, চাঁদবিষয়ক আয়াতটি এবং কয়েকটি হাদীস আমরা এ পর্বে যথাযথ বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন করেছি। আশা করি সত্যানুসন্ধিৎসু মন নিয়ে অধ্যয়ন করলে আর কোনো সংশয় থাকার কথা নয়। এ ছাড়া ফিক্বহী গ্রন্থ থেকে তারা একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে থাকে, তা নিম্নরূপ-

اختلاف المطالع ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى بحر من الخلاصة ، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب، إذا ثبت عندهم روية أولئك بطريق موجب۔

সূর্য মধ্যাকাশ থেকে হেলে যাওয়ার আগে বা পরে, কোনো স্থানে চাঁদ দেখা গেলে যাহেরী মাযহাব অনুযায়ী অন্য কোনো ভিন্ন স্থানের অবস্থা বা চাঁদ না দেখা যাওয়ার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকাংশ উলামাগণের মত এটাই। যদি প্রাচ্য অধিবাসীদের নিকট পশ্চিমা কোনো দেশে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছে তাহলে প্রাচ্য দেশবাসীদের ওপর সে অনুযায়ী রোযা ও ঈদ উদ্‌যাপন করা আবশ্যক হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী ৩/৩৬৩)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি হানাফী মাযহাবের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ফাতাওয়ার কিতাব ফাতাওয়ায়ে শামী থেকে উল্লেখ করা হলো। একই ভাষ্য আরো বিভিন্ন ফাতাওয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে। তবে জানা দরকার, এ উদ্ধৃতিটি কুরআনের নয়, হাদীসের নয়। কুরআন এবং হাদীসের উদ্ধৃতি আমরা ইতিপূর্বে স্ববিস্তারে উল্লেখ করেছি। তাই এ উদ্ধৃতির সঠিক মর্ম কুরআন ও হাদীসের মর্মানুসারে বুঝতে হবে। যারা সৌদি আরবের সাথে একই দিনে রোযা শুরু ও ঈদ করার পক্ষে তাদের দাবি হলো, তারা কুরআন-হাদীস মতো আমল করেন। তাই উল্লিখিত কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি মতে তাদের আমল করা চাই। ফাতাওয়া বলতে কিছুই তারা মানে না। অতএব ফাতওয়ার কিতাবের কোনো উদ্ধৃতি পেশ করা তাদের জন্য শোভা পায় না। যারা ফাতওয়া মতে সবক্ষেত্রে আমল করেন তারাই শুধু ফাতওয়া পেশ করা বা ব্যাখ্যা করার অধিকার রাখেন।

এ মর্মে বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরামের অসংখ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অংশ হিসেবে মাত্র কয়েকটি উক্তি নিম্নে উপস্থাপনের প্রয়াস পাব।

ক. আল্লামা তক্বী উসমানীর বিশ্লেষণ :

আমার ধারণা, ইমাম আবু হানীফা ও তৎকালীন ইমামগণ চাঁদ উদয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানের ব্যবধান গ্রহণযোগ্য হবে না বলে যে উক্তি ব্যক্ত করেছেন এর বিশেষ কারণ হলো, কোনো পশ্চিমা দেশে চাঁদ দেখার সাক্ষী বা সংবাদটি পূর্বের কোনো দেশে পৌঁছানোর উপায় তদানীন্তনকালে মোটেও ছিল না। বরং তা মাত্র কল্পনাপ্রসূত ও অনুমাননির্ভর বিষয় ছিল। এ ধরনের অনুমাননির্ভর ও কাল্পনিক বিষয় থেকে শরীয়তের কোনো বিধান সাব্যস্ত হয় না। তাই এ ধরনের বিচিত্র বিষয়কে তারা মা'দুম বা অস্তিত্বহীন বলে ফাতাওয়া দিয়ে থাকে। এ কারণেই তারা চাঁদ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উদয় হওয়া অসম্ভব বলে ফাতাওয়া দিয়েছেন।

চলমান বিশ্বে বিমান যোগাযোগ ও (তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব) উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে পুরো পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। সাথে সাথে প্রাচ্য থেকে কোনো তথ্য-সাক্ষী পাশ্চাত্যে পৌঁছানো কাল্পনিক বিষয় নয়; বরং প্রতিদিনের সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে যদি প্রাচ্যের সংবাদকে পাশ্চাত্যের জন্য বা পাশ্চাত্যের সংবাদকে প্রাচ্যের জন্য গ্রহণ করা না হয়, তাহলে এর ফলে পৃথিবীর কোনো স্থানে একই মাসের ২৮ দিন। আবার কোনো স্থানে ৩১ দিন হওয়া জরুরি হয়ে পড়বে। তাই যেসব দূরবর্তী দেশের মধ্যে মাসের দিন গণনার ক্ষেত্রে কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওই সব দেশে চাঁদ উদয়ের ভিন্নতাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তা-ই মূলত হানাফী মাযহাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। (দরসে তিরমিযী ২/৩৫৭)

খ. আল্লামা ইউসুফ বিন্নূরী (রহ.)-এর বিশ্লেষণ :

ভারত বর্ষে হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ গবেষক, আল্লামা ইউসুফ বিন্নূরী (রহ.)-এর আলোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

"তদানীন্তনকালে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার সহজ কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চাঁদ উদিত হয় এমন একটি স্থান থেকে অন্য স্থানে সংবাদ পরিবেশন করার কোনো উপায় ছিল না। ফলে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চাঁদ উদয় হওয়ার বিষয়টা তাদের জন্য অবাস্তব ছিল। (মা'আরিফুস সুনান ৫/৩৩৮-৩৩৯)

পরিশিষ্ট :

পরিশেষে আলোচ্য বিষয়ে কয়েকজন বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতামত উল্লেখ করে সমাপ্তি টানব।

আল্লামা আব্দুল হাই (রহ.) লিখেন, কুরআন-হাদীস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ মত হলো, যেসব দূরবর্তী দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চাঁদ উদয় হয়, এমন একটি দেশে চাঁদ দেখা গেলে অন্য দেশের জন্য তা প্রযোজ্য হবে না। (খোলাসা, পার্শ্ব টিকা ১/২৫৬)

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) লিখেন, দূরবর্তী দেশসমূহের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চাঁদ উদয় হতে পারে। আর এ মতটিই হানাফী মাযহাবের গ্রহণযোগ্য মত। (রুইয়াতে হেলাল ৫৮)

আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) লিখেন, হানাফী মাযহাবের কিছু কিতাবের উদ্ধৃতিতে যদিও বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চাঁদ উদয়ের এই ব্যবধান গ্রহণযোগ্য নয় বলে উল্লেখ আছে, তবে বিজ্ঞ গবেষক ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়া হলো, যেসব দূরবর্তী দেশগুলোর মধ্যে একটিতে চাঁদ উদিত হওয়ার সময় অপরটির সঙ্গে মিল নেই, সেসব দেশের ক্ষেত্রে চাঁদ উদয়ের ব্যাপারটা ভিন্ন ভিন্নভাবেই গ্রহণ করা হবে। ইরাকের হানাফী ফক্বীহগণ ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) এমনই ফাতাওয়া দিয়েছেন। (ইমদাদুল মুফতীয়ীন ২/৪৬৭)

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম, আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লায়ী (রহ.) লিখেন, চাঁদ উদয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করাই যুক্তিপূর্ণ। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যে যে পরিস্থিতিতে আছে এর ওপর ভিত্তি করে আমল করার জন্যই নির্দেশ করা হয়েছে। আর সূর্যের আলোকরশ্মি থেকে চাঁদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একেক স্থানে একেকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এভাবেই প্রাচ্যে যে মুহূর্তে সূর্য হেলে পড়ে, ঠিক ওই মুহূর্তে পাশ্চাত্যে সূর্য হেলে পড়া জরুরি নয়। (তাবয়ীনুল হাক্বায়েক্ব ১/৩২১)

সর্বশেষে সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ বিন বায (রহ.)-এর মতামতটি উপস্থাপনের প্রয়াস পাব, তিনি লিখেন,

فيعمل بهم فى المكان الذى رئى فيهم وفى مكان يوافقهم فى مطلع الهلال، وأما من لا يوا فقهم فى مطلع الهلال، فإنه لم يره حيقة ولا حكما۔

যে স্থানে চাঁদ দেখা গেছে এবং যেসব স্থানের সাথে চাঁদ উদয়ের ক্ষেত্রে মিল আছে ওই অঞ্চলের লোক এ অনুযায়ী আমল করবে। আর যেসব স্থান চাঁদ উদয়ের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে মিল নেই বা পরে উদয় হয়, তারা প্রত্যক্ষভাবে তো চাঁদ দেখেইনি, এ ছাড়া তারা এমন স্থানে ছিল, যেখানে তখন চাঁদ উদয় হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। তাই পরোক্ষভাবেও তারা চাঁদ দেখেনি। (ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে বালাদিল হারাম-২৮৫)

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর মাধ্যমে
তাবলীগি কাজের সূচনা-৪

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

বাংলাদেশে তাবলীগ জামাআতের সূচনা ও বিকাশ

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই তাবলীগ জামাআতের কর্মতৎপরতা বিদ্যমান রয়েছে এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও এ জামাআতের কার্যক্রম সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং এর জনপ্রিয়তা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে এর সূচনা হয় বড় হুজুর মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ)-এর অক্লান্ত পরিশ্রমে। তিনি ছিলেন বাগেরহাট জেলার অধিবাসী। স্থানীয় মোল্লাহাট থানার উদয়পুর মাদ্রাসার শিক্ষক থাকাবস্থায় তিনি একবার কলকাতা গমন করেণ। সেখানকার তাবলীগি মারকাযে কিছুদিন দাওয়াতী কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৪৪ সালের শেষ দিকে তাবলীগের একটি জামাআতের সাথে তিনি কলকাতা হতে দিল্লি গমন করেন। একই বছর দিল্লি হতে একটি ছোট জামাআত নিয়ে ফিরে আসেন এবং বাংলাদেশে তাবলীগের মেহনত আরম্ভ করেন। বাংলাদেশে ফিরে এসে তিনি ঢাকার চকবাজার এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং বড়কাটরা মসজিদকে কেন্দ্র করে তাবলীগের কাজের সূচনা করেন। পরবর্তী সময়ে লালবাগ, বেগম বাজার ও কাকরাইল মসজিদে জামাআতের কাজ সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে এই কাকরাইল মসজিদই তাবলীগের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

অন্য এক সূত্রে জানা যায় যে, হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ)-এর সাথে নিযামুদ্দীনে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় হযরতজী তাকে বাংলাদেশে তাবলীগের কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন। দেশে ফিরে হযরত ফরিদপুরী (রহ.) এ দায়িত্ব মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ.)-কে প্রদান করেন এবং তাকে কলকাতা মারকাযে পাঠিয়ে দেন। তিন চিল্লা শেষ করে তিনি নিযামুদ্দীন হয়ে দেশে ফিরে উদয়পুর মাদ্রাসা-মসজিদকে মারকায ঠিক করে তাবলীগের কাজ আরম্ভ করেন। এটাই বাংলাদেশে তাবলীগি কাজের সূচনাপর্ব এবং বাগেরহাটের উদয়পুর মাদ্রাসা-মসজিদ বাংলাদেশে তাবলীগি কাজের প্রথম মারকায।

(মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) স্মারক গ্রন্থ পৃ. ৩৪৫)

উদয়পুর মারকাযকে কেন্দ্র করে প্রায় দুই বছর কাজ করার পরে তেরখাদা থানার বামন ডাঙ্গায় মারকায স্থানান্তর করা হয়। এটা ছিল বাংলাদেশে তাবলীগের দ্বিতীয় মারকায। মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ.)-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এখানে লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ফলে মারকায খুলনা শহরে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং হেলাতলার তালাবওয়ালী মসজিদে মারকায স্থানান্তরিত হয়। এ সময় মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ.) মারকাযেই অবস্থান করতেন। তালাবওয়ালী মসজিদে মারকায থাকাকালে একবার ইজতিমার পর পরামর্শ সভায় মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী বললেন, বাবা আব্দুল আযীয! দেখো, এক জায়গায় রূহ আরেক জায়গায় কাজের বরকত হচ্ছে না, তুমি লালবাগ শাহী মসজিদে চলে আসো। সুতরাং মারকায ঢাকার লালবাগে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এটা হলো চতুর্থ মারকায।

লালবাগ শাহী মসজিদে মারকায স্থানান্তরিত করে কাজ আরম্ভ করলে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে শাহী মসজিদে স্থান সংকুলানের অভাব দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে লালবাগ কেল্লার উত্তর-পশ্চিম দিকে খান মুহাম্মাদ মসজিদকে মারকায স্থির করে মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ.) এখানে চলে আসেন। এটা ছিল বাংলাদেশে তাবলীগি কাজের ৫ম মারকায। খান মুহাম্মাদ মসজিদে মারকায স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মসজিদসংলগ্ন মাঠে ইজতিমার সুযোগ পাওয়া। কিন্তু দুই বছর যেতে না যেতেই এই মাঠেও ইজতিমার জায়গা সংকুলান হলো না। ফলে পরামর্শ মোতাবেক রমনা ময়দানের পাশে তৎকালীন মালওয়ালী মসজিদে মারকায স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ভিত্তিতে ১৯৫২ সালে সেই মালওয়ালী মসজিদে মারকায স্থানান্তর করা হয়। এই ষষ্ঠ মারকায বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মারকাযের মর্যাদা লাভ করে। এটাই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বখ্যাত কাকরাইল মসজিদ। বর্তমান বিশ্বে এমনও লোক আছে, যারা বাংলাদেশের নাম না জানলেও কাকরাইলের নাম জানে।

লালবাগ মাদ্রাসার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আব্দুল মজীদ ঢাকুবী হুজুর একদিন মুসলিম শরীফের দরসে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : আমি এবং তাবলীগ জামাআতের আমীর মাওলানা

আব্দুল আযীয (রহ.) খুলনার উদয়পুর মাদ্রাসায় পড়তাম, সেখান থেকে সদর সাহেব হুজুর আমাকে গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসায় নিয়ে আসেন। আর মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ.)-কে দিল্লির নিযামুদ্দীনে হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন যে, যাও সেখানে মাওলানার সান্নিধ্যে থেকে তাবলীগের কাজ পুরোপুরি জেনে আসো এবং বাংলাদেশে এ কাজ ব্যাপকভাবে চালু করো। এরই ফলশ্রুতিতে আজ বাংলাদেশে তাবলীগের কাজ এত ব্যাপকতা লাভ করেছে। (স্মারক গ্রন্থ ৩৩৬ পৃ.)

বাংলাদেশে তাবলীগি কাজের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালে হযরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেব এবং মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব ঢাকা পৌঁছেন। ঢাকা এবং এর আশপাশে বেশ কিছু ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। জামাআত তৈরি হয়। নভেম্বরে খুলনায় একটি ইজতিমা হয়। উক্ত ইজতিমায় মাওলানা ইউসুফ সাহেব শরীক না হতে পারলেও মাওলানা উবাইদুল্লাহ বলিয়াবী তাতে অংশ নেন। এই ইজতিমা অত্যন্ত সফল হয়।

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রামে ইজতিমা হয়। এতে মাওলানা ইউসুফ সাহেব শরীক হন। ওই সময়ে ঢাকা এবং খুলনায়ও ইজতিমা হয়। এর পরে তো ঢাকায় প্রতিবছরই ইজতিমা হতে থাকে আর তাবলীগের কাজে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। বাংলাদেশিদের দাওয়াতে হযরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেব ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে পুনরায় বাংলাদেশ সফর করেন। ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবার তিনি বাংলাদেশ সফরে আসেন। এই সফরে মাওলানা এনামুল হাসানও তার সাথে ছিলেন। ঢাকা থেকে সফর শুরু হয়। সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, ফরিদপুরেও সফর হয়। হযরত মাওলানার বাংলাদেশের এই সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয় এবং মানুষের দ্বীনি ফায়েদার সাথে সাথে কাজের ওপরও এর বড় প্রভাব পড়ে।

পাকিস্তানে তাবলীগি জামাআতের সূচনা

পাকিস্তানে তাবলীগ জামাআতের পরিচয় এবং কর্মকাণ্ডের সূচনা হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর যুগেই হয়েছিল। করাচিতে সর্বপ্রথম জামাআত এসেছিল ১৩৬২ হিজরীতে জিঅ্যান্ডজি কোম্পানির মালিকের উদ্যোগে। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর সাথে তাদের মোটামুটি একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে ছোট একটি জামাআত সিন্ধুতে গিয়েছিল। জামাআতের আমীর ছিলেন মাওলানা কারী রেজা হাসান সাহেব। মাওলানা আব্দুর রশীদ নুমানী (রহ.)ও এই জামাআতে শামিল ছিলেন।

টান্ডু কায়সারে একটি ইজতিমা হলো এবং সিন্ধুর একটি জামাআত জয়পুর হয়ে নিযামুদ্দীন উপস্থিত হলো। মাওলানা আব্দুর রশীদ নুমানী সাহেব উক্ত জামাআতের আমীর ছিলেন। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় আরেকটি জামাআত এল করাচিতে, যার আমীর ছিলেন মৌলবী রেজা হাসান সাহেব, এই জামাআতের মাধ্যমেই করাচিতে দাওয়াতী কাজের সূচনা হলো এবং নিয়মিত জামাআত বের হতে থাকল। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) চাইতেন বন্দর এলাকায় যেন খুব মেহনত হয় যাতে করে সেখান থেকে অন্যান্য দেশে বিশেষ করে আরব দেশগুলোতে জামাআত যেতে পারে। সিন্ধুতে যখন তৃতীয় জামাআত এসে কাজ শুরু করল তখন মৌলবী হাশেম জান সাহেবের এই কাজের সাথে বেশ আন্তরিকতা পয়দা হয়ে গেল। তিনি নিযামুদ্দীন তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সে সময় পেশাওয়ার এবং কালাতেও দাওয়াতের কাজের সূচনা হয়ে গিয়েছিল। পেশাওয়ার থেকে একটি জামাআত জনাব আব্দুর রশীদ আরশাদ, মৌলবী এহসানুল্লাহ নদবী এবং মিস্ত্রী আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখ সাথীবর্গসহ এসেছিল। তাদের মেহনতে এই দুই জায়গায় তাবলীগের কাজ বেশ জোরেশোরে শুরু হয়ে গেল। ফলশ্রুতিতে মাওলানা ইউসুফ সাহেব ১৯৪৬ সালের মে মাসে এই দুই জায়গায় সফর করলেন এবং বিভিন্ন ইজতিমায় বয়ান রাখলেন। এভাবে পুরো এলাকায় কাজ গতি লাভ করল।

করাচির প্রথম ইজতিমা

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর এমন অনেক লোক ভারত থেকে হিজরত করে পাকিস্তানে পাড়ি জমিয়েছিল, যারা তাবলীগের মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আবার যেখানে তারা হিজরত করেছিল সেখানেও আগে থেকে কিছুটা মেহনত চালু ছিল। এভাবে নতুন-পুরাতন শক্তি মিলে তাবলীগের কাজ সেখানে জোরদার হলো এবং রায়ব্যান্ডে মারকায প্রতিষ্ঠিত হলো। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের প্রথম তাবলীগি ইজতিমা ২৬ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত হয়। হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহ.) এতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের ৫ মার্চ লাহোরেও একটি ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মাওলানা ইউসুফ সাহেব তাতে অংশ নেন। ইজতিমা শেষ করে তিনি করাচি যান এবং সেখানে ১০ দিন অবস্থান করেন।

১৯৫০ সালের ২০ এপ্রিল পেশাওয়ারে

একটি ইজতিমা হয়। তাতে মাওলানা ইউসুফ সাহেব ছাড়াও মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী এবং হাফেজ ফখরুদ্দীন সাহেব অংশগ্রহণ করেন। এই ইজতিমা থেকে ফারেগ হয়ে মাওলানা ইউসুফ সাহেব করাচি তাশরীফ নিয়ে যান এবং সেখানে ১০ দিন অবস্থান করে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। ১৯৫২ সালের ১৮ এপ্রিল শেখরে ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে পাকিস্তানে দাওয়াতী কাজ করার একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, যার আলোকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সারা পাকিস্তানে দাওয়াতী কাজ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। সে সময়ে পশ্চিম পকিস্তানে সাতটি মারকায যথা–করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, লাহোর, হায়দারাবাদ, পেশাওয়ার, কোয়েটা এবং মুলতান আর পূর্ব পাকিস্তানে তিনটি মারকায যথা–কাকরাইল, চট্টগ্রাম এবং খুলনা নির্ধারণ করা হয়। এসব মারকায থেকে জামাআতের আসা-যাওয়া উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।

রায়ব্যান্ড

রায়ব্যান্ড মারকায থেকে তাবলীগের কাজ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। মাওলানা ইউসুফ (রহ.) এখানে এসে বিভিন্ন ইজতিমায় খুব বয়ান করেন। রায়ব্যান্ডের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মাওলানা মুহাম্মাদ সানী লেখেন : রায়ব্যান্ড মারকাযে অসংখ্য বয়ান হয়েছে। যার বদৌলতে হাজার হাজার মানুষ ঈমান ও একীনের দৌলত লাভ করেছে এবং নিজেদের জীবনকে তাবলীগের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। আরব এবং অন্যান্য দেশের আলেম-উলামারা হাজির হয়েছে আর তাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা দ্বারা স্থানীয়রা উপকৃত হয়েছে। আর আজও উক্ত মারকায থেকে তাবলীগি কিরণ বিচ্ছুরিত হয়ে পূর্ব-পশ্চিমে আলো ছড়াচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকার অগণিত মুসলমান এই মারকাযে এসে এখানকার প্রোগ্রামে নিয়মিত শরীক হয় অতঃপর নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তাবলীগের কাজ শুরু করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তানের ভাইয়েরা যে মেহনত, মুজাহাদা, কুরবানী আর ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে এই তাহরীককে বেগবান করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াকে যেভাবে ব্যাপক করেছে তা সত্যিই বর্ণনার বাইরে। পাকিস্তানি সাথি ভাইয়েরা শুধুমাত্র নিজেদের দেশে তাবলীগ করেছেন এমনটি নয় বরং তারা অন্যান্য দেশ যথা-সিরিয়া, মিসর, হেজায, ইরাক, জর্দান, লিবিয়া, তুরস্ক, জাপান, জার্মান, ইংল্যান্ডসহ ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতেও সময় লাগিয়েছেন এবং অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করেছেন। আবার অন্যান্য দেশের জামাআত নিজেদের দেশে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের দ্বারা দেশের মধ্যে মেহনত করিয়েছেন। তাদের এই সহযোগিতায় সারা দুনিয়া একটা খেত্তায় পরিণত হয়েছে। যেখানে সীমানাপ্রাচীর এখন গৌণ।

রায়ব্যান্ড মারকাযের কর্মব্যস্ততা

পৃথিবীতে তাবলীগ জামাআতের সবচেয়ে বড় মারকায হচ্ছে নিযামুদ্দীন, যা দিল্লিতে অবস্তিত। দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ মারকায হচ্ছে রায়ব্যান্ড। এই মারকাযে সব সময় ১০-১৫ হাজার লোক বিদ্যমান থাকে। এই মারকাযের প্রতিদিনের খরচ হচ্ছে প্রায় ২ লাখ টাকা। পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন ১০০টির মতো জামাআত এই মারকাযে আসে। আর সারা বছরে আগমনকারী জামাআতের সংখ্যা হচ্ছে ৩৬০০০। অবশ্য এটি রায়ব্যান্ড ইজতিমা থেকে বের হওয়া ৫০০০ জামাআতের অতিরিক্ত। প্রতিটি জামাআতের গড় সদস্য সংখ্যা যদি হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যায় প্রতিবছর ৪ লাখ ৩২ হাজার ব্যক্তি নিজ নিজ শহর থেকে জামাআতবদ্ধ হয়ে রায়ব্যান্ডে আগমন করে এবং সেখান থেকে দিকনির্দেশনা লাভ করে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যায়। রায়ব্যান্ড থেকে প্রতিবছর প্রায় ১০০টি জামাআত দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার জন্য পায়দল বের হয় আর ৭৫টিরও বেশি দেশে কাজ করার জন্য বের হয় ৩০০ জামাআত। যারা ১ থেকে দেড় বছরের জন্য বের হয়।

ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য এবং বহির্বিশ্বে অবস্থিত দ্বীন থেকে গাফেল মুসলমানদের অন্তরকে ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্য তাবলীগি মিশন নিয়ে যতগুলো জামাআত বের হয় তার চেয়ে বেশি জামাআত এবং ব্যক্তি দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দ্বীন শেখার জন্য পাকিস্তানে আগমন করে। রায়ব্যান্ড মারকাযে সব সময় পৃথিবীর প্রায় ৫০টি দেশের বিভিন্ন রং ও বর্ণের মানুষ আপনার দৃষ্টিগোচর হবে। যারা এখানে দ্বীন শিখে নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে তাবলীগের মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সেখানে মেহনত করে আরো জামাআত ও ব্যক্তিকে তারা পাকিস্তানে পাঠান। এরাই সেসব ব্যক্তি যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খতমে নবুওতের মিশন নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে ঘুরছে আর আল্লাহ ভোলা বান্দাদেরকে আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দেয়ার মেহনত করছে। তাদের এই মেহনতে বড় বড়

শরাবী-কাবাবী, যিনাকার, ব্যভিচারী নিজেদের গোনাহ থেকে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে।

লোক সমাগমের দিক থেকে হজ্বের পরে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সম্মেলন হচ্ছে রায়ব্যান্ডের ইজতিমা। (তবে বর্তমানে বাংলাদেশের বিশ্ব ইজতিমাই দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে) যেখানে শুধুমাত্র স্থানীয় প্রায় ২৫ লাখ লোক অংশগ্রহণ করে। আর পৃথিবীর প্রায় ১০০টি দেশ থেকে লোকজন স্পেশাল বিমান ভাড়া করে চলে আসে। এই ইজতিমার জন্য কোনো পাবলিসিটি এবং কোনো

বিজ্ঞাপন-প্রচার-প্রচারণা চালানো হয় না। বরং তারা কোনো নতুন ব্যক্তিকে ইজতিমায় আনতেই নিষেধ করেন। কেননা লাখ লাখ মানুষের এই ইজতিমায় নতুন কোনো ব্যক্তি- যে তাবলীগি মেহনতের সাথে পরিচিত নয়, কষ্ট বরদাশত করতে অভ্যস্ত নয়-তার থাকা-খাওয়াতে সমস্যা হওয়াটাই স্বাভাবিক, সুতরাং তার দ্বারা এই মুজাহাদা একটু কষ্টকরই বটে। তাই যারা পূর্বে থেকেই মেহনতের সাথে জড়িত, তাবলীগে সময় লাগিয়ে অভ্যস্ত, মুজাহাদা করতে প্রস্তুত তাদেরকেই শুধু শরীক হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়।

এবার আপনি নিজেই চিন্তা করুন, কোনো পাবলিসিটি ছাড়া যে ইজতিমায় লাখ লাখ লোক অংশগ্রহণ করে, যদি পাবলিসিটি করা হতো তাহলে তাতে লোক সমাগম কেমন হতো? কিন্তু

তাবলীগওয়ালাদের উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, লাখ লাখ লোক সমবেত হোক, বড় কোনো সমাবেশ হোক, বরং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই ইজতিমার মাধ্যমে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে বেশি থেকে বেশি লোককে কিভাবে আল্লাহর রাস্তায় বের করা যায়।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, রায়ব্যান্ড ইজতিমা থেকে প্রতিবছর প্রায় ৫০০০ জামাআত এক চিল্লা থেকে নিয়ে তিন চিল্লার জন্য বের হয়। যার সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০-৭০ হাজার। আর পৃথিবীর প্রায় অর্ধশতাধিক দেশে যাওয়ার জন্য ৪০ থেকে ৫০টি জামাআত তৈরি হয়, যারা সাত মাস থেকে নিয়ে এক বছর পর্যন্ত সময়ের জন্য বের হয়ে থাকেন। এই ইজতিমা থেকে দেশ এবং বিদেশে এক বছরের পায়দল জামাআতও বের হয়। তারা এমন সব এলাকায় গমন করে যেখানে বছরের পর বছর কোন দাঈর (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর) কদম পড়েনি, কিংবা সেখানকার লোকজন দ্বীন থেকে একেবারেই গাফেল।

জামাআতের আকর্ষণ

সারা দুনিয়ায় তাবলীগের মেহনত নিয়ে যেসব জামাআত ঘোরাফেরা করছে তার বেশ কয়েকটি ফায়েদা স্পষ্ট। প্রথমত, এই জামাআতগুলো যেসব দেশে গমন করে সেখানে তারা এয়ারপোর্ট থেকে মসজিদ পর্যন্ত সাধারণত পায়ে হেঁটেই সফর করে। সফরের মধ্যেই নামাযের সময় হলে আযান দিয়ে সড়কের পাশেই জামাআতসহ নামায আদায় করে নেয়। অন্যদিকে তাদের চেহারা-সুরতেও নববী আদর্শের ছাপ স্পষ্ট বিদ্যমান থাকে। এসবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ আকর্ষণ রেখেছেন। অমুসলিমরা তাদেরকে অপলক নেত্রে দেখতে থাকে। অনেক অমুসলিম তরুণ-তরুণী কৌতূহলী হয়ে তাদের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করে আপনারা কারা? আপনাদের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। আপনাদের পোশাকে অনেক গাম্ভীর্যতা আছে। উত্তরে তারা যখন ইসলামের মর্মবাণী শোনান তখন সেখানেই অনেকে মুসলমান হয়ে যায়। জামাআত আকারে এরা যখন দৃষ্টি অবনত করে রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলেন, তখন অনেক অমুসলিম দেখে মন্তব্য করে 'গুড মুসলিম'। মোটকথা, জামাআতের আমলদার সাথিদের মধ্যে এমনই এক আকর্ষণ রয়েছে যে, তাদেরকে দেখে হাজারো অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে।

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় জামাআত

প্রায় সকল মুসলমানই তাবলীগ জামাআতের কাজ দেখছেন। বস্তুত জামাআতে যারা বের হয় তারা নিজেদের এসলাহের জন্যই বের হয়। সাধারণ মানুষদের জন্য এই নেসাব হচেছ তিন চিল্লা। আর আলেম-উলামাদের জন্য হচ্ছে এক বছর। এই সফরে বের হয়ে তারা কালেমা-নামায, যিকির-ফিকিরের মশক করেন। দূরে থেকে তাবলীগি জামাআত সম্পর্কে পুরাপুরি ধারণা করা মুশকিল। পুরাপুরিভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত না হলে এর হাকীকত ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না। যেমন নাকি আম বা আপেল না খেয়ে শুধু তার আকার আকৃতি দেখলে তার স্বাদ অনুভব করা যায় না। তাবলীগ জামাআত আজকের বিশ্বে সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক এসলাহী সংগঠন। যার সদস্য সারা বিশ্বজুড়ে রয়েছে। এক সমীক্ষা অনুযায়ী,

তাবলীগের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির সংখ্যা পাকিস্তানে প্রায় ১ কোটি, ভারতে ৮০ লাখ আর বাংলাদেশে ২ কোটিরও অধিক। এছাড়া সারা বিশ্বে এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা ৩ কোটিরও বেশি। মোটকথা, সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে এটি এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় জামাআত, যা আজ ৭৩ বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও স্বীয় পূর্ণ শক্তিতে বিদ্যমান।

বিশ্বের বেশ কয়েকজন শাসক এবং অনেক পুঁজিপতি সক্রিয়ভাবে তাবলীগের মেহনতের সাথে জড়িত এবং প্রতি মিনিটে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা অত্যন্ত নীরবতার সাথে এবং একান্ত এখলাসের সাথে আল্লাহর দ্বীন প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করছেন। প্রতিটি সেক্টরে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এই মেহনতের সাথে জড়িত। সকলে নিজের ব্যয় নিজেই নির্বাহ করেন। আমীরের আনুগত্য করেন। জামাআতের সাথে আপনি যেকোনো শহরে যান না কেন আর সেখানে আপনার ঘনিষ্ঠজন কোনো আত্মীয় থাকুক না কেন, আমীরের বিবেচনা ছাড়া আপনি তার সাথে মুলাকাত করতে পারেন না। আর এদিক-ওদিক ঘোরাফেরার অনুমতি তো আমীর সাহেবও দেন না। জামাআতের সাথিরা নিজেদের খানা নিজেরাই পাক করেন। খানা হয় সাদাসিদা। গরিব থেকে গরিব মানুষও নির্দ্বিধায় জামাআতের সাথে চলতে পারেন। চলার পথে নিজেদের সংক্ষিপ্ত সামানা নিজেরাই বহন করেন। কোটিপতি ব্যবসায়ী, সরকারি আমলা, চাকরিজীবী, জেনারেল, আলেম-উলামা, সাধারণ থেকে সাধারণ সকলেই স্ব স্ব মালসামানা নিজের কাঁধে উঠিয়ে সারা দুনিয়ায় ফিরছেন, মেহনত করছেন, এতে তারা কোনো হীনমন্যতা বোধ করেন না। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই জামাআতের কোনো পত্রপত্রিকা নেই, প্রচারমাধ্যম নেই, মিডিয়া নেই, কোনো পতাকা নেই, কোনো রোয়েদাদ নেই। আজকের যুগের জন্য যেগুলো অপরিহার্য। এখানে যা আছে তা হচ্ছে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা মোতাবেক আমীরের আনুগত্য।

কুরআনুল কারীমের পরে সবচেয়ে বেশি পঠিত কিতাব

সারা পৃথিবীর বুকে কুরআনুল কারীমের পরে সবচেয়ে বেশি পঠিত হাদীসের কিতাব হচ্ছে ফাযায়েলে আমল। যার তালীম প্রতিটি মুহূর্তে সকাল কিংবা সন্ধা, দিন কিংবা রাত চালু রয়েছে। শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর সংকলিত হাদীসের এই কিতাবটি পৃথিবীর প্রায় ১২৫টি দেশে পঠিত হয়ে আসছে এবং প্রায় ১০৯টি ভাষায় তা অনূদিত হয়েছে। এই কিতাবের বদৌলতে লাখ লাখ মানুষের জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) হাদীসের অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও শরাহ শুরুহাত লিখেছেন কিন্তু ঈমান ও আমল সম্পর্কিত তার লিখিত ফাযায়েলে আমল যে পরিমাণ মকবুল হয়েছে এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তার কোনো নজির পৃথিবীতে নেই। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, উর্দুসহ অন্যান্য ভাষায় এই কিতাবটি প্রায় ৫ কোটি কপি মুদ্রিত ও বিক্রিত হয়েছে। পৃথিবীর হাজারো মসজিদে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা এই কিতাব থেকে পড়ে শোনানো হয় এবং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কুরআনে কারীমের তেলাওয়াতের পরে কিতাব সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণীসম্বলিত যে কিতাবটি সবচেয়ে বেশি পঠিত হয় তা হচ্ছে এই ফাযায়েলে আমাল।

হেকায়েতে সাহাবা, ফাযায়েলে নামায, ফাযায়েলে কুরআন, ফাযায়েলে রমযান, ফাযায়েলে যিকির এবং ফাযায়েলে তাবলীগসম্বলিত প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠার এই কিতাবটি অত্যন্ত সহজ-সাবলীল ভাষায় রচিত। আলোচ্য বিষয়সম্বলিত কিতাবটি একটি সুবাসিত ফুলদানি, যার খুশবুতে সারা বিশ্ব মোহিত হচ্ছে এবং বিশ্বের যে কেউ এই কিতাবটি ছাপাতে পারেন। অবশ্য সর্বপ্রথম এই কিতাবটি হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.)-এর জনৈক আত্মীয় প্রকাশ করেছিলেন। কিতাবটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা লক্ষ করে অন্য প্রকাশকরাও ব্যাপকভাবে এটি ছাপিয়ে বিক্রি করতে শুরু করলে হযরত শাইখের উক্ত আত্মীয় আদালতে মামলা দায়ের করলেন যে, অন্য কারো জন্য এটি ছাপানোর অনুমতি নেই। শাইখুল হাদীস সাহেব এই সংবাদ অবগত হয়ে তার আত্মীয়কে ডেকে বললেন, তুমি আদালতে এই বয়ান দিও যে, কারো জন্য এটি প্রকাশের অনুমতি নেই। আর আমি লেখক হিসেবে আদালতে এই মর্মে বয়ান দেব যে, পৃথিবীর যেকোনো স্থানে যে কেউ এটি প্রকাশ করতে পারবে। উক্ত আত্মীয় লজ্জিত হয়ে মামলা থেকে ফিরে এল।

শাইখুল হাদীস (রহ.) যদি এটি নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখতেন তাহলে আজ পর্যন্ত তিনি এর থেকে কোটি কোটি টাকা কামাই করতে পারতেন। কিন্তু তখন কিতাবে ঐ বরকত আর নূর থাকত না, যা এখন আছে এবং এই পরিমাণ মাকবুলিয়াতও হাসিল হতো না।

ফাযায়েলে আমল পড়ে এক মডার্ন জজের পরিবারে আমূল পরিবর্তন

আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগের কথা। ফাযায়েলে আমল তখন ধীরে ধীরে জনসাধারণের নিকট পরিচিত হচ্ছে এবং ব্যাপকহারে পঠিত হচ্ছে। ফাযায়েলে আমলের এই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা দেখে বিরুদ্ধবাদীরা এই মর্মে আদালতে মামলা দায়ের করল যে, এই কিতাবে যঈফ হাদীস একত্রিত করা হয়েছে, যা পড়ে মানুষ গোমরাহ হচ্ছে। সুতরাং এটিকে নিষিদ্ধ করা হোক।

মামলার আলামত হিসেবে কিতাবটি যখন জজের সামনে রাখা হলো, তখন তিনি কিতাবটি নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, এটি তো ৬০০-৭০০ পৃষ্ঠার বিশাল কিতাব। সুতরাং এটি পড়া ছাড়া আমার পক্ষে রায় দেয়া সম্ভব নয়। অতঃপর তিনি বেশ কিছুদিন পরে মামলার তারিখ দিলেন। জজ সাহেব আদালতের কাজ থেকে ফারেগ হয়ে কিতাবটি নিয়ে বাড়িতে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করে কিতাবটি তিনি কুরআন শরীফ রাখার তাকে রেখে দিলেন। জজ সাহেবের স্ত্রী বিষয়টি লক্ষ করলেন যে, আজ পর্যন্ত তিনি যত বই-পুস্তক নিয়ে এসেছেন সব ওকালাতের বইয়ের আলমারিতে রেখেছেন, আজ কী এমন কিতাব নিয়ে এলেন, যেটিকে কুরআন শরীফের আলমারিতে রাখলেন। তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, জজ সাহেব বিশেষ কোনো কাজে সেদিনই শহরের বাইরে চলে গেলে তার স্ত্রী যে কিনা খুবই মডার্ন ছিল এবং তার ছেলে ছিল পশ্চিমা সভ্যতার একান্ত ভক্ত আর মেয়ে ছিল ফ্যাশন প্রিয়। তারা একে একে এই কিতাবটি পড়লেন। কিতাবে বর্ণিত হাদীসগুলো তাদের ওপর এমনই প্রভাব ফেলল যে, হেদায়েতের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল।

মা-ছেলে আর মেয়ের অন্তরে ইসলামী আদর্শ এমনই প্রভাব বিস্তার করল যে, তারা ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকতে শুরু করল এবং নামায শুরু করে দিল। জজ সাহেব ২-১ দিন পরে যখন বাড়িতে ফিরে এলেন তখন বাড়ির এই পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। বললেন, আমার ঘরে দ্বীন এল কিভাবে? স্ত্রী বললেন, আপনি যে কিতাব নিয়ে এসেছিলেন, তা আমরা সকলে পড়েছি এবং আমল শুরু করে দিয়েছি। এটা ঐ কিতাবেরই বরকত। বিবি-বাচ্চার এই অবস্থা দেখে জজ সাহেবের অন্তরেও ইসলামের মহব্বত ঘর করে নিল। তিনিও ফাযায়েলে আমল পড়তে শুরু করলেন। তার মধ্যেও পরিবর্তন এল। এবং এই সব কিছু মাত্র অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মামলার নির্ধারিত তারিখও এসে গেল। আদালতের একদিকে তাবলীগের সহকর্মীরা আর অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদীরা দণ্ডায়মান ছিল। মামলার কার্যক্রম শুরু হলো। একপর্যায়ে জজ বললেন, ভাই! এটা তো এমন কিতাব যে, আমার অনুপস্থিতিতে আমার মডার্ন ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী এই কিতাব পড়ে তাদের জীবনে আমূল-পরিবর্তন এসেছে। তাদের জীবন ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। আর আমাদের জনসাধারণ যদি এই কিতাব পড়ে তাহলে তাদের জীবনেও ইসলামের ছোঁয়া লাগা স্বাভাবিক। এই কিতাব তো হেদায়েতের পথনির্দেশক। আমার মত হচ্ছে, দেশের প্রতিটি মসজিদে এই কিতাবের তালীম চালু করা হোক। এই বলে তিনি মামলা খারিজ করে দিলেন। (তাবলীগ জামাআত কী? ১৪৬ পৃষ্ঠা)

বহির্বিশ্বে মেহনতকারী তাবলীগী সাথিদের খরচ ৩শ কোটি টাকা

সারা দুনিয়ায় আজ তাবলীগ জামাআত মেহনত করছে। তারা আমেরিকায় যাচ্ছে, আফ্রিকায় যাচ্ছে, ইউরোপে যাচ্ছে, আফ্রিকার জংগলে ঘুরছে, কানাডার বরফপাতের মধ্যে ঘুরছে- যেখানে তাপমাত্রা হিমাংকের নীচে। আবার যেখানে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রির উপরে সেখানেও জামাআত ফিরছে। কেন তারা এ ভাবে ঘর-বাড়ী ছেড়ে জংগলে-মরুভূমিতে ঘুরছে? এই জন্যই যে, তাবলীগের এই মেহনত শুধু তাবলীগের সাথিদের সাথেই সম্পৃক্ত নয় বরং খতমে নবুওয়াতের উসীলায় প্রতিটি উম্মতের দায়িত্ব এটা। এরা যদি বিশেষ কোন দলের হত তাহলে তাদের নিকট থেকে সব খরচ নিয়ে আসত। বলত তোমাদের কাজে যাচ্ছি, আমার খরচ-পাতি দাও। যখন ভোট শুরু হয় তখন ক্যান্ডিডেটের পক্ষে যারা প্রচারণা চালায় তারা ক্যান্ডিডেট থেকেই নিজেদের সব খরচ উসুল করে নেয়। গাড়ি-পেট্রোল, খাবার দাবার সব সে-ই বহন করে। তার পক্ষে অফিস খোলা হয়। রেজিষ্টার তৈরী হয়, হিসাব কিতাব রাখা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, সারা বছরে যে হাজার হাজার জামাআত বের হচ্ছে, তাদের কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, এর জন্য না তো কোন অডিটর আছে আর না কোন ফান্ড। বিগত ইজতিমায় পাকিস্তান থেকে বিদেশে যাওয়ার জন্য তিনশটি জামাআত তৈরী হয়েছে। তিনশ জামাআতে প্রায় তিন হাজার মানুষ আছে। প্রতিটি জামাআতের খরচ যদি গড়ে এক লাখ টাকা ধরা হয় তাহলে তিনশ জামাআতের খরচ কত কোটি টাকা হবে? অথচ রায়ব্যান্ড থেকে তাদেরকে একটি পয়সাও দেয়া হয় না, যার যার নিজের খরচ। তাহলে এ ভাবে মানুষ এই কোটি কোটি টাকা কেন খরচ করছে? শেষ নবীর উম্মত হওয়ার কারণে খতমে নবুওয়তের যে যিম্মাদারী আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে সেটা পালন করার জন্যই এই জান-মালের ব্যয়। এটা শুধু তাবলীগ জামাআতের সদস্যদের উপরেই নয় বরং সমস্ত মুসলমানদের যিম্মাদারী।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৪

তাকলীদ :

লা-মাযহাবী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে মৌলিক মতবিরোধ হচ্ছে তাকলীদ নিয়ে। তারা তাকলীদকে শিরক বলে। আর আমাদের মতে তাকলীদ ওয়াজিব। কুরআন-হাদীসের অসংখ্য আয়াত এবং বর্ণনার মাধ্যমে এ কথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, ঈমানদারদের জন্য তাকলীদের কোনো বিকল্প নেই। তাকলীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে স্মর্তব্য যে, তিনটি শব্দ রয়েছে, ইত্তেবা, ইক্তিদা এবং ইতা'আত। লা-মাযহাবীরা যখন আমাদেরকে সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করে এবং তাকলীদকে সরাসরি শিরক বলতেও কুণ্ঠাবোধ করে না, তখন তারা ওই সমস্ত আয়াত তিলাওয়াত করে তাকলীদের বিষোদগার করে থাকে, যে সমস্ত আয়াতে ইত্তেবা, ইক্তিদা এবং ইতা'আতের নিন্দা করা হয়েছে। ছলছাতুরীর আশ্রয় নিয়ে তারা সেখানে ওই সব শব্দের অনুবাদ তাকলীদ দিয়ে করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমরা যখন ওই সব আয়াত দিয়ে তাকলীদের প্রমাণ পেশ করি, তখন তারা চেঁচিয়ে ওঠে এবং বলে এখানে তো ইত্তেবা, ইক্তিদা এবং ইতা'আতের কথা বলা হয়েছে, তাকলীদের আলোচনা করা হয়নি। তোমরা তাকলীদের পরিভাষা কোথা হতে উদ্ভাধন করলে? আমরা বলি, আরে নির্বোধের দল, এগুলো হচ্ছে কিছু পরিভাষামাত্র। আর প্রত্যেক ফন তথা বিষয়ে থাকে তাদের নিজস্ব কিছু পরিভাষা। অনেকেই অজ্ঞতাবশত বলে থাকে, তাকলীদ শব্দটি আমাদেরকে কুরআনে দেখাও! আমি প্রত্যুত্তরে বলি, আমরা যদি তাকলীদ শব্দটি মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন বলে দাবি করতাম, তাহলে না হয় আমরা এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতাম। কিন্তু এই দাবি এখনো কোনো সত্যপন্থী আলেম করেননি এবং ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত করবেনও না। বরং আমরা বলি, তাকলীদ শব্দটি আমরা ইত্তেবা, ইক্তিদা এবং ইতা'আতের সারনির্যাস হিসেবে বর্ণনা করে থাকি। তথা পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত।

তাকলীদ করতে হয় কেন?

একজন সাধারণ মুসলমান যখন দ্বীনের ওপর চলতে চায়, তখন সে এমন কতক মাসায়েলের সম্মুখীন হয়, যেগুলো গাইরে মানছুছ আলায়হি (কুরআন-হাদীসের যে সমস্ত সমস্যার সমাধান স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়নি) এবং মুজতাহাদ ফিহি (মতবিরোধপূর্ণ)। আর সাধারণত ওইসব মাস'আলার সমাধান এবং প্রমাণাদি অতি সূক্ষ্ম হয়ে থাকে, যা উপলব্ধি করা একজন সাধারণ মুসলমান তো বটে, অনেক সময় আলেমের পক্ষেও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই এসব ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানের জন্য ওই মুজতাহিদের অনুসরণ করা ব্যতিরেকে অন্য কোনো বিকল্প রাস্তা খোলা থাকে না। এই অনুসরণকে আমাদের পূর্ববর্তীরা অতি সতর্কতাবশত ইত্তেবা, ইক্তিদা এবং ইতা'আতের পরিবর্তে তাকলীদ বলে নামকরণ করেছেন। কারণ অন্য সব শব্দ মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তারা বিস্তর গবেষণা এবং অনেক পর্যালোচনার মাধ্যমেই এই নামটি নির্বাচন করে দিয়েছেন। এখানে অত্যন্ত মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের প্রতিপক্ষ বন্ধুরা তাকলীদকে শিরক আখ্যা দিয়ে এর স্বপক্ষে অনেক আয়াত উপস্থাপন করে, কিন্তু সেখানে একটা আয়াতেও তাকলীদ শব্দটি নেই। না থাকলে কী হবে? সেখানে তারা ইত্তেবা, ইক্তিদা এবং ইতা'আত তথা বর্ণিত প্রতিটি শব্দের অনুবাদ করে থাকে তাকলীদ দিয়ে। তাদের ভাবসাব এবং হম্বিতম্বি দেখে মনে হয় যে, আমাদের মুকাল্লিদ আখ্যা দিয়ে কাফের প্রমাণিত করতে পারলেই যেন তাদের দীর্ঘদিনের মনের জ্বালাটা মিটবে।

আমি বলে থাকি, কোনো বস্তুর বৈধ-অবৈধ হওয়ার মাপকাঠি যদি এটা হয় যে, শব্দটি হুবহু কুরআনে উল্লেখ থাকতে হবে। তাহলে তাওহীদ (একাত্মবাদ) শব্দটিও কিন্তু কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। এ থেকে কি এ কথা বলা যাবে যে, তাওহীদ শব্দটি যেহেতু কুরআনে স্পষ্ট বর্ণিত নেই, তাই আল্লাহর একাত্মবাদও প্রমাণিত নয়। এই কথা যেমন সম্পূর্ণ ভুল এবং ডাহা মিথ্যা, তেমনি যে কথাটি পূর্বে মেনে নিয়েছিলাম, (অর্থাৎ কোনো বস্তুর বৈধ-অবৈধ হওয়ার মাপকাঠি হলো, শব্দটি কুরআনে হুবহু উল্লেখ থাকতে হবে) সেটিও প্রমাণও যুক্তির নিরিখে সম্পূর্ণ ভুল।

বন্ধুরা! পবিত্র কুরআন হলো, এমন এক হেদায়েত গ্রন্থ, যাতে মানবজাতির সংশোধন এবং পথপ্রদর্শনের জন্য যত বিষয়ের প্রয়োজন আছে সবই

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত হয়েছে। সেটা কোনো অভিধান গ্রন্থও নয়। তেমনি কোনো শাস্ত্রের গ্রন্থও নয়। যেমন ধরুন, পবিত্র কুরআনে মিসকীন শব্দও ব্যবহার হয়েছে, তেমনি ফকীর শব্দটিও অনেক জায়গায় এসেছে। পবিত্র কুরআন মিসকীন শব্দটিকে ফকীরের অর্থেও ব্যবহার করেছে, আবার ফকীরকে মিসকীনের অর্থেও ব্যবহার করেছে। উভয় ব্যবহারে কোনো পার্থক্য করেনি। অথচ শব্দ বিশ্লেষকদের মতে, ফকীর এবং মিসকীনের মাঝে অর্থগত বিশাল তারতম্য রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রত্যেক পরিভাষার পারিভাষিক শব্দ কুরআনে স্পষ্ট বর্ণিত হতে হবে, এ ধরনের কোনো শর্তারোপ করা সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীস পরিপন্থী। শব্দের আভিধানিক এবং পারিভাষিক অর্থ জাতির সামনে পেশ করা, বা অন্যান্য তদসংশ্লিষ্ট বিষয় বস্তুকে উম্মাহর সামনে স্পষ্ট করা, এগুলো উলামায়ে কেরামের মহান দায়িত্ব। এসব খেদমত কুরআন-হাদীস পরিপন্থী নয়, বরং কুরআন-হাদীসের সহায়ক বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

তাই যারা কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন শব্দের ওপর গবেষণা করে তাকলীদ শব্দটি বের করেছেন, তারা কুরআনের বিকৃতি তো ঘটাননি বরং কুরআনের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

তাকলীদের প্রমাণ :

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং অনেক হাদীস থেকে তাকলীদের গুরুত্ব প্রতিভাত হয়। নিম্নে শুধু কয়েকটা আয়াত এবং হাদীস উপস্থাপন করার প্রয়াস পাব।

তাকলীদ বিষয়ে কুরআন-হাদীস কী বলে

প্রথম আয়াত-

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

'তোমাদের জ্ঞান না থাকলে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করো।' (সূরা আম্বিয়া-৭, সূরা নাহল-৪৩)

কোনো বিষয়ে নিজে অজ্ঞ হলে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের শরণাপন্ন হতে হয়। কুরআনও বলছে, ধর্মীয় বিষয়ে তোমার জ্ঞান না থাকলে যারা জানে, তাদের কাছ থেকে জেনে আমল করো। এরই নাম হচ্ছে তাকলীদ।

প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর জগৎখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে কাবীর' এবং আল্লামা আলূসী তাঁর বরেণ্য তাফসীর গ্রন্থ 'রুহুল মা'আনীতে' লিখেন, উপরোল্লেখিত আয়াতের ভিত্তিতে অনেকেই মুজতাহিদ ইমামদের তাকলীদ বৈধ এবং কুরআন-সুন্নাহর সুষ্ঠু সমাধানে অনভিজ্ঞ সবাইকে বিজ্ঞ মুজতাহিদের শরণাপন্ন হওয়া ওয়াজিব বলেন।

দ্বিতীয় আয়াত :

يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসূলের। আর তোমাদের মধ্যে যারা 'উলিল আমর' বা বিজ্ঞ তাদেরও।' (সূরা নিসা-৫৯)

বর্ণিত আয়াতে মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের ইতা'আতের (আনুগত্যের) পাশাপাশি বিজ্ঞ আলেমও মুজতাহিদ ইমামগণেরও ইতা'আতের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ ইতা'আতের পারিভাষিক নাম হলো 'তাকলীদ'।

তাকলীদ সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য :

খায়রুল কুরুন তথা সাহাবা যুগের অবস্থা ছিল, সাহাবায়ে কেরাম হয়তো মুজতাহিদ ছিলেন অথবা মুকাল্লিদ ছিলেন, কেউ গায়রে মুকাল্লিদ ছিলেন না। তাবেঈনদেরও একই অবস্থা। তখন থেকে আজ পর্যন্ত উম্মতের এই ধারাই চলে এসেছে যে, হয়তো মুজতাহিদ অথবা মুকাল্লিদ। হাদীস শরীফ থেকে আমরা শুধু একটি ঘটনা উপস্থাপন করব, যেখানে সাহাবায়ে কেরামের তাকলীদে শাখছীর কথা বিবৃত হয়েছে। যাকে লা-মাযহাবীরা শিরক বলতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। বুখারী শরীফের হজ্ব অধ্যায়ে হযরত ইকরামা (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, একদল মদীনাবাসী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে একবার মাসআলা জিজ্ঞেস করল যে, ফরয তাওয়াফের পর এবং বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বে কোনো মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হলে সে কী করবে? (বিদায়ী তাওয়াফের জন্য স্রাব বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করবে, নাকি তখনই বিদায়ী তাওয়াফ না করে মক্কা শরীফ ত্যাগ করতে পারবে।) ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, বিদায়ী তাওয়াফ না করেই মক্কা শরীফ ত্যাগ করতে পারবে। দলটি বলল, যায়েদ বিন সাবিত (রা.)-কে উপেক্ষা করে আমরা আপনার মতামত মানতে পারি না। যেহেতু এ ক্ষেত্রে পবিত্র মদীনাবাসীর ইমাম হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর ফাতাওয়া ছিল, ওই মহিলাকে অবশ্যই বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে, তাছাড়া তার জন্য মক্কা শরীফ ত্যাগ করা বৈধ হবে না।) (বুখারী শরীফ ২/৫৪১ (১৭৫৮-১৭৫৯)

আলোচ্য হাদীস থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, মদীনাবাসী দলটি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)–এর মুকাল্লিদ অনুসারী ছিল। তাই তার মোকাবিলায় অন্য কারও মতামত তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না, বরং তারা যায়েদের ইলম ও জ্ঞানের ওপর সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে শুধু তারই

তাকলীদ করা ওয়াজিব ও জরুরি এবং তার বিপক্ষে কারও কথা মানা অবৈধ মনে করতেন। আর এরই নাম তাকলীদে শাখছী বা ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হলো যে, উম্মাহর স্বর্ণালি যুগ হতে দুটি ধারা চলে আসছে। একটি মুজতাহিদ, অন্যটি মুকাল্লিদের ধারা। এখানে তৃতীয় কোনো ধারা নেই। সাথে সাথে তাকলীদের ক্ষেত্রেও তাকলীদে শাখছী বা ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ করতে হবে। ফাতাওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে নিজের মাযহাবের গণ্ডি অতিক্রম করাও বিধিসম্মত নয়। বরং এটা সম্পূর্ণ নিষেধ।

অন্য মাযহাব অনুযায়ী ফাতাওয়া দেয়া বৈধ কি না?

এ প্রশ্ন অবশ্যই বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। কোনো হানাফী, শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী অথবা শাফেয়ী হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ফাতাওয়া দিতে পারবে কি না? মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-কে একবার এই প্রশ্ন করা হলে, তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, অবশ্যই বৈধ। কিন্তু ফাতাওয়া কে দেবে? সহজ উত্তর হচ্ছে, ওই ব্যক্তিই ফাতাওয়া দেবে, যে ফাতাওয়া দেয়ার উপযুক্ত। যার মধ্যে বাস্তবেই ফাতাওয়া দেয়ার যোগ্যতা আছে। এ ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দের রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান। 'আল হিলাতুন নাজেযাহ লিল হালাতিল আজেযা' নামক গ্রন্থটি এ বিষয়ে মূল গ্রন্থের দাবি রাখে। বর্তমানে যারা সৌদি আরবে মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, তারা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তাদের মতে হজ্বের মধ্যে 'মবিত ফিল মিনা' তথা মিনায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে মিনায় রাত্রে অবস্থান করা সুন্নত। কিন্তু সৌদি আরবের মুফতীরা বর্তমানে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতের ওপরই ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ কেউ যদি মিনায় রাত্রে অবস্থান না করে তাহলে তার হজ্ব পূর্ণ হয়ে যাবে। প্রকাশ্য কথা যে, অন্য মাযহাবের ফাতাওয়া থেকে উপকৃত হওয়া, এটা সর্বসাধারণে সাধ্যের ভেতর নেই, বরং এটা শুধু উলামায়ে কেরামেরই দায়িত্ব।

এ ক্ষেত্রে চার মাযহাবের ইমামরা অত্যন্ত উদারতা এবং পরমত সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। এক মাযহাবের ইমামরা অন্য মাযহাবের মাসআলাও গ্রহণ করেছেন। তবে হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে তারা কিছু নিয়মনীতির অনুসরণ করেছেন।

চার মাযহাব : উম্মাহর মাঝে কি বিভেদ সৃষ্টি?

লা-মাযহাবীরা অত্যন্ত জোরেশোরে এ কথা প্রচার করে থাকে যে, চার মাযহাব এটা উম্মতের মাঝে একটা ফাটল সৃষ্টিরই নামান্তর। তাই আমরা (লা-মাযহাবীরা) মাযহাব অস্বীকার করে থাকি। তাদের আলোচনা শুনে কারো মনে হতে পারে যে, চার ইমামের অনুসারীরা যেন এই মাত্র লাঠিসোঁটা নিয়ে ঝগড়া করার জন্য মাঠে নেমে পড়বে! উম্মাহের ঐক্য আর সংহতির জন্য লা-মাযহাবীদের সে কী মায়াকান্না! অথচ এ ধরনের কিছুই নয়। তারা একে অপরকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। এক ইমামের অনুসারীরা অন্য ইমামের মতামতকে নিজেদের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করে থাকেন এবং সেখান থেকে তারা উপকৃত হন। একে অপরের পেছনে নামায পড়ে থাকেন। কোনো হানাফী মুকাল্লিদ যদি শাফেয়ী ইমামের কাছে একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করতে যায়, তখন শাফেয়ী ইমাম অত্যন্ত বিশ্বস্ততা এবং আমানতদারীর সাথে তাকে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। চার মাযহাবের ইমামরা এতই বিশ্বস্ত এবং আমানতদার হয়ে থাকেন। অন্যদিকে লা-মাযহাবীরা এতই লাজ-লজ্জাহীন এবং ধূর্ত হয়ে থাকে যে, তারা আমাদের মতামতকে নিজেদের মতামত হিসেবে চালিয়ে দেয় এবং মুকাল্লিদদের ধর্মীয় আক্বীদা বিশ্বাসকে নড়বড়ে করার হীন চেষ্টায় মেতে ওঠে। এই কথা ভুলেও উল্লেখ করে না যে, এই মত কোনো ইমামের! এখন আপনারাই বলুন, বিভেদ আর অনৈক্য কি আমরা সৃষ্টি করছি, না তারা সৃষ্টি করছে? চার মাযহাবের অনুসারীরা অন্য মাযহাবের ইমামকে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে সামান্যতমও কুণ্ঠাবোধ করে না। জিজ্ঞেসকারী যেমন উদার মানসিকতার হয়ে থাকে, তেমনি উত্তর প্রদানকারীও আমানতদার এবং বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। লা-মাযহাবীরাই সংকীর্ণ মানসিকতায় লিপ্ত যে, তারা কোনো ইমামের অনুসারীদের কাছে মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে প্রস্তুত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মন-মানসিকতাসম্পন্ন কোনো লোক, সাথে সাথে দ্বীনি বিষয়ে তাকে হতে হবে তথাকথিত অতি মুক্ত মনা পাওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনের তৃষ্ণা মেটে না। কোনো লা-মাযহাবী যদি চার মাযহাবের কোনো আলেমকে মাসআলা জিজ্ঞেস করে, তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, সে তাকে পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করছে। মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য নয়। লা-মাযহাবী আলেমরা এ ক্ষেত্রে শতভাগ সফল যে, তারা তাদের জাহেলদেরকে আমাদের আলেমদের পেছনে লেলিয়ে দিতে পারঙ্গমতা দেখিয়েছে। তাদের আলেমরা কখনো জনসম্মুখে বা আলেমদের কাছে আসে না। বরং

সাধারণ লোকদের উত্তেজিত করে আমাদের সাথে আলোচনা করতে পাঠায়। সে আমাদের আলেমকে জানার জন্য জিজ্ঞেস করে না, বরং বিরক্ত করার জন্যই মাস'আলা জিজ্ঞেস করে।

এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় :

যখন লা-মাযহাবীদের লেলিয়ে দেওয়া সাধারণ লোকেরা আমাদের আলেমদেরকে বিরক্ত করবে, তখন তাদেরকে একটু সচেতনতা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে হবে। যখন তারা জিজ্ঞেস করবে যে, মাওলানা! নামাযে হাত কোথায় বাঁধবে? আমীন উচ্চস্বরে বলবে? না নিম্নস্বরে বলবে? ইমামের পেছনে কেরা'আত পড়ার বিধান কী? রফ'য়ে ইয়াদাইনের বিধান কী? তখন আমরা সাধারণত কী করি? আমরা তাদেরকে কিতাবের লম্বা লম্বা দাস্তান এবং দস্তাবেজ শুনিয়ে দিই। কিন্তু ওই বেচারা তো অনবগত। সে আপনার আলোচনার আগামাথা কিছুই বুঝে উঠতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে সে আপনার ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপস্থাপনকৃত সাতকাহনের গোড়ায় জল দিয়ে বলে ওঠে, আমি এসব কিচ্ছু মানি না। তখন ওই আলেম হতাশ হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকে! কিন্তু এটা কি আসল কর্মপন্থা? বরং কার্যকর কর্মপন্থা হলো, সে যখন আপনার কাছে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করবে, তার ওপর প্রভাব বিস্তার করার পরীক্ষিত পদ্ধতি হচ্ছে, তাকে হৃদ্যতা এবং আন্তরিকতা দিয়ে নিজের কাছে করে নেয়া। তার সাথে পুরোপরি আন্তরিকতা সৃষ্টি হওয়ার পর তাকে পাল্টা প্রশ্ন করুন, যেসব বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে, সেসব বিষয়ে তোমার মতামত কী? অথবা তুমি কী মনে করো? যেমন সে জিজ্ঞেস করল, নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত কোথায় বাঁধবে? তখন তাকে জিজ্ঞেস করুন, এ বিষয়ে আপনি কী বলেন? তখন সে বলবে, হাত সিনার ওপর বাঁধতে হবে। তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করুন, সিনার ওপর হাত বাঁধা, এটাকে আপনি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব তথা কোন স্তরের বিধান বলে আপনি মনে করেন? অথবা যে আলেম আপনাকে বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি এটাকে কোন স্তরের বিধান হিসেবে বর্ণনা করেছেন? কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে তাওয়াজু এবং বিনয় অবলম্বণ করতে হবে। তার সাথে না জানার ভাণ এবং দয়ার আচরণ করতে হবে। আপনি তো ব্যস্ত লোক, পড়ালেখার খুব একটা সুযোগ হয়নি। আপনি এই বিধানটা কিভাবে জানতে পেরেছেন? তখন সে বলবে, আমি ইন্টারনেটে বিষয়টা দেখেছি। সে কিন্তু হুট করে তার প্রশিক্ষকের নাম বলবে না। তাকে তো পূর্বে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যে, তুমি ভুলেও প্রশিক্ষকের নাম উচ্চারণ করবে না। আপনি যদি তাকে একটি প্রশ্নপত্র দিয়ে তার প্রশিক্ষকের কাছে পাঠাতে পারেন, তাহলেই আপনি সফল। বড় বড় ভলিয়মের গ্রন্থ রচনার কোনো প্রয়োজন নেই। তাকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার মতামত কী? স্পষ্ট কথা হচ্ছে, যেহেতু সে শরীয়তের পরিভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত নয়, তাই সে বলবে, সিনার ওপর হাত বাঁধতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে, দেখুন, শরীয়তে প্রত্যেক বিধানের একটা স্তর আছে, যেমন নামাযে রুকুতে যে তাসবীহ পড়তে হয় কেউ যদি ওই তাসবীহ ছেড়ে দেয়, তাহলে তার নামায বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি সূরা ফাতিহা ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে না। এখন তাকে বলুন, যে তোমাকে সিনার ওপর হাত বাঁধতে বলেছে তাকে জিজ্ঞেস করো, সিনার ওপর হাত বাঁধার বিধান কী? আমরা যুদ্ধক্ষেত্র নির্ণয় করার পূর্বেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পড়ি। প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্র নির্ণয় করি। সে বলবে, রফয়ে ইয়াদাইনের কথা হাদীসে আছে। আপনি বলুন, অবশ্যই, হাদীসে আছে। আমরাও নামাযের শুরুতে রফয়ে ইয়াদাইন করে থাকি! কিন্তু তুমি বলো, রফয়ে ইয়াদাইনের বিধান কী? নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করার বিধান তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? ইনশাআল্লাহ কয়েক বৈঠকে সে সঠিক পথে চলে আসবে। এমতাবস্থায় যখন এই লোকটি ওই আলেমের কাছে প্রশ্নপত্র নিয়ে যাবে, তখন ওই আলেম, যিনি মাসের পর মাস পরিশ্রম করে তাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিল, সেই তাকে নসিহত করবে যে, ওই মৌলবীর কাছে আর যেয়ো না। সেজন্য সারা বিশ্বের লা-মাযহাবীদের বদঅভ্যাস হলো, তারা জ্ঞানীদের কাছে যেতে মোটেও প্রস্তুত নয়। তারা অজ্ঞদেরকে বিভিন্নভাবে উত্তেজিত করে তুলে। কলকাতা শহর আপনাদের নিকটবর্তী শহর, সেখানকার লা-মাযহাবীরা কিছুদিন পূর্বে সারা শহর মাথায় তুলে। আমরা কয়েকজন যুবককে বিষয়গুলো এভাবে বুঝিয়ে দিই। আমরা তাদেরকে ১০% বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু তারা ৯০% কাজের সফলতার কৃতিত্ব দেখায়। তারা মাগরিবের সময় এক গায়রে মুকাল্লিদ আলেমের মসজিদে নামায পড়ে। তারা ইমামের পেছনে উচ্চস্বরে কেরাত পড়া আরম্ভ করে। নামাযের পর মসজিদে শোরগোল-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়ে যায়। তারা এসব কাজ এজন্য করেছে, যেন তাদেরকে বসানো হয়। মসজিদের মুসল্লী সবাই বসে পড়ে। ওই যুবকদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমরা নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পড়লে কেন? তারা বলল, হাদীস শরীফে আছে

সূরা ফাতিহা ব্যতিরেকে নামায পূর্ণ হয় না। চাই ইমামের নামায হোক, বা মুক্তাদীর। এজন্য আমরা সূরা ফাতিহা পড়েছি। তখন ইমাম সাহেব বললেন, কেরাত তো নিম্নস্বরে পড়তে হয়। তখন তারা বলল, সেখানে তো নিম্নস্বরে পড়তে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তখন ইমামের অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। প্রথমে সে তাদেরকে বাচ্চা বলে এড়িয়ে যেতে চাইলেও তারা বলল, না আমরা এই বিষয়ে প্রমাণ চাই। ইমাম সাহেব নিরুপায় হয়ে বললেন, ঠিক আছে, এক সপ্তাহের মধ্যে আমি হাদীস দেখাব। দেখুন! একটু বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করায় ওই সব লোকের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়ে গেছে, যারা নিজেদেরকে মুজাতাহিদ বলে দাবি করছে এবং অন্যের ইজতিহাদের ওপর আমল করার কারণে আমাদেরকে মুশরিক ফাতাওয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করছে না। তখন ওই যুবকরা বলল, ঠিক আছে, ইমাম সাহেব! আমরা এক সপ্তাহ আপনার পেছনে এভাবে নামায পড়ব। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বচক্ষে দলিল প্রত্যক্ষ করব না, ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবেই আমল করব। ইমাম সাহেব এখানে ফোন করছেন, ওখানে ফোন করছেন। শেষ পর্যন্ত ইশার সময় একটা মুসলিম শরীফ পাওয়া গেল। মুসলিম শরীফ থেকে সে দলিল দিল- اقرأ بها فى نفسك

অর্থাৎ, সে অনুবাদ করল, ফাতিহা মুখ দিয়ে ছোট করে পড়ো। যুবকরা বলল, মাওলানা! এখানে মুখ কোন শব্দের অনুবাদ করলেন? ইকরা অর্থ, পড়া, بها অর্থ, ফাতিহা। فى نفسك অর্থ, অন্তরে অন্তরে। তখন সে বলল, অন্তরে অন্তরে পড়া আর মুখে ছোট করে পড়া একই কথা। তখন ওই যুবকরা বললেন, মাওলানা! আপনি একদিন জুমু'আর বয়ানে বলেছিলেন, মুখে ছোট করে নিয়ত করা বিদ'আত। এখানে তো আপনার কথার মাঝে বৈপরীত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কমিটি ওই ইমাম সাহেবের দুর্বলতা ধরতে সক্ষম হয়। তখন যুবকরা বলল, ইমাম সাহেব! আমরা তো ওই সমস্ত আলেমের (মুকাল্লিদ আলেম) কাছে যেতে চাই না, যারা আপনাদের কথা অনুযায়ী নবী মানে না, তাকলীদের মতো মারাত্মক শিরক করে। ইশার নামাযে এদের পাল্লা আরো ভারী হয়ে যায়। আগে ছিল পাঁচজন। এখন হয়ে গেছে ১৫ জন। তখন তারা বলল, আমাদেরকে হাদীস দেখিয়ে আহলে হাদীসের দীক্ষা দিন। তখন ওই ইমাম হাত জোড় করে মিনতি করে, আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত ইমাম সাহেব তাদের ওই মসজিদ থেকে পালিয়ে কোনো রকমে নিজের ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত করে।

এভাবে আমাদেরকেও কিছুটা বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশলের সাথে এগোতে হবে। তখন ইনশাআল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উম্মাহর সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রন্থনা ও অনুবাদ :
হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-৩

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

কুরআন ও হাদীসে কোথাও চার মাযহাব অনুসরণের কথা নেই

ডা. জাকির নায়েক বলেছেন-

It is a misconception that a Muslim should follow any one of these four schools of thoughts i.e. Hanafi, Shafi, Hanbali or Maliki. There is no proof whatsoever in the Qur'an or any authentic Hadith that a Muslim should only follow one of these four Imams.

"মুসলিম উম্মাহের মাঝে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, মুসলমানদের চার মাযহাবের কোনো একটি অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, অথবা হাম্বলীর অনুসরণ করতে হবে। অথচ কুরআন ও 'সহীহ' হাদীসের কোথাও নেই যে, মুসলমানদের চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণ করা উচিত"

(http://www.irf.net/index.php? option =com_content&view= article&id=459%3Awhich-school -of-thought-should-a-m uslim- follow&catid =76%3Aqueries-on-isl am-may-2011&Itemid=199)

এখানে ডা. জাকির নায়েক যে কথাটি বলেছেন, এটি স্বাভাবিকভাবে অধিকাংশ লা-মাযহাবী বা সালাফীরা বলে থাকেন। অনেক সাধারণ মুসলমানও এর দ্বারা একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান। আসলেই তো কুরআন ও হাদীসে কোথাও চার ইমামের অনুসরণের কথা নেই; তবে আমরা কেন তাদেরকে অনুসরণ করতে যাব?

বিজ্ঞ পাঠক! শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েক বলেছেন-

"Many of my talks are based on his research Mashallah!

"আমার অনেক লেকচার শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি।"

(Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _ AHL E HADITH - YouTube http://www.youtube.com/watch? v=Szzn9lFg9n0)

এখন কেউ যদি তাঁকে প্রশ্ন করে, "কুরআন ও হাদীসে কোথাও তো একথা নেই, ইসলামের তের শ' বছর পরে নাসীরুদ্দিন আলবানী নামে এক লোক আসবে, তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তুমি তোমার লেকচার তৈরি করবে"

ডা. জাকির নায়েক আরও বলেছেন,

১. what he says, I follow on the face of it

"তিনি যা বলেন, আমি সে অনুসারে চলি"

(ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/ 07/28/various-public-lectures-by -dr-zakir-naik/)

"কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোথাও নেই যে, নাসীরুদ্দিন আলবানী যা বলবেন, সে অনুসারে চলো"

ডা. জাকির নায়েকের যারা ভক্ত রয়েছেন, যারা তার মাসআলা গ্রহণ করে থাকেন, তাদেরকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই যে, জাকির নায়েক নামে এক লোক আসবে আর তোমরা তার অনুসরণ করবে।

আমরা জানি, কুরআন ও হাদীসে সকল বিষয়ে মূলত একটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়। অতঃপর এ মূলনীতির আলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, খলিফা, বিচারক বা আমীরের অনুসরণের বিষয়টি। সঠিক পথপ্রাপ্ত খলিফা, আমীর বা শাসকের অনুসরণ যে ফরয এ সম্পর্কে কেউ দ্বিমত পোষণ করে না। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে। এখন ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক যদি প্রশ্ন করে যে, আমাদের আমীর বা শাসকের নাম তো কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই, তাহলে আমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ পালন করা জরুরি না, তবে এ ব্যক্তি যে সুস্পষ্ট ভুলের মাঝে রয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়।

একইভাবে, কুরআনে ও সহীহ হাদীসে মূলনীতি দেয়া আছে যে, মাসআলা-মাসাইল ও ইজতেহাদের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ উলামায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞাসা করবে এবং মুজতাহিদ উলামায়ে কেরামের জন্য কর্তব্য হলো, তারা তাদের সাধ্যানুযায়ী ইজতেহাদ করবে।

স্পষ্টত ফিকহের বিষয়ে কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর হাদীসে শুধু মূলনীতি দেয়া আছে, সুনির্দিষ্টভাবে কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। এখন এ মূলনীতির আলোকে উলামায়ে কেরাম নির্ধারণ করেছেন, মাসআলা-মাসাইল গ্রহণের ক্ষেত্রে কাদের কথা গ্রহণযোগ্য এবং কাদের ফাতাওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

ডা. জাকির নায়েক তাঁর প্রায় লেকচারে বলে থাকেন, কুরআনের পরে সহীহ বোখারীর অবস্থান। বিশুদ্ধতার বিচারে

সহীহ বোখারীর অবস্থান হলো-"আছাহ্হুল কুতুব বা'দা কিতাবিল্লাহ" (কুরআনের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো, সহীহ বোখারী)। এটি একটি স্বীকৃত বিষয়। এখন ডা. জাকির নায়েককে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, এ কথাটি কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই যে, কিতাবুল্লাহর পরে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হল সহীহ বোখারী। তবে কি কেউ সহীহ বোখারী সম্পর্কে এ কথা বলতে পারবে যে, এটি একটি প্রচলিত ভুল ধারণা, এটি কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোথাও নেই?

এর সহজ উত্তর হলো, এটি উলামায়ে কেরামের "ইজমা" দ্বারা প্রমাণিত। একইভাবে, রাসূল (সা.)-এর প্রতিটি হাদীস সহীহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের ওপর। কেননা, রাসূল (সা.)-এর কোনো হাদীসে বলা থাকে না যে, এটি সহীহ, এটি যয়ীফ, এটি জাল হাদীস। এ কাজটি মূলত করেন হাদীস বিশারদ উলামায়ে কেরামগণ।

উলামায়ে কেরামের ওপর নির্ভর করে আমরা কোনো হাদীসকে সহীহ, যয়ীফ হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু আমাদের অবস্থা হলো, উলামায়ে কেরামই যখন ফিকহী বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করছেন- "এদের ফাতাওয়া গ্রহণযোগ্য, এদের ফাতাওয়া গ্রহণযোগ্য নয়" তখন আমরা তাদের সে বক্তব্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই।

লক্ষণীয় যে, ডা. জাকির নায়েকের উল্লিখিত বক্তব্যে সবচেয়ে বড় ভুল হলো, তিনি বলেছেন, চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণের কথা "কুরআন" ও "সহীহ হাদীসে" নেই।

আমাদের প্রশ্ন হলো, ইসলামের বিধিবিধানের উৎস কি শুধু "কুরআন" ও সহীহ হাদীস?

যদি তিনি বলেন, হ্যাঁ। তবে আমরা বলব- তিনি নিজেই নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছেন। কেননা ডা. জাকির নায়েক নিজে "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ" শিরোনামের লেকচারে বলেছেন-

In the Shariah, in the Islamic ruling, the highest authority, there are four catagories; the highest authority is the Quran. If you do not find in the Quran, you go to the next source, that is the Hadith, the Sahih Hadith, the Sayings of the Prophet. The commandment of the Prophet carries more weight than the action of the Prophet. If the commandment and action contradict the commandment carries weight. The third source: the Sahaba's Ijma. The three generations, Sahaba, Tabi'een, and Tabi' Tabi'een. The Ijma' of these people of the Sahaba, carries more weight than the individual opinion of the Sahaba. Then Tabi'een and Tabi'-Tabi'een. And the last source is the Qiyas. If you don't find it in any top three sources, in the Quran, in the Hadith, in the lifestyle of the Sahaba, Tabi'een and Tabi'-Tabi'een, then you can use Qias, analogy, deduction.

"ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধান প্রমাণিত হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উৎস হলো চারটি। এর মাঝে সর্বোচ্চ প্রমাণ হলো, কুরআন। যদি তুমি কুরআনে না পাও তবে দ্বিতীয় উৎসের দিকে যাও। হাদীস। সহীহ হাদীস। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমল থেকে শক্তিশালী। যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী এবং আমল স্ববিরোধী হয়, তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী প্রাধান্য পাবে। তৃতীয়টি হলো, সাহাবীদের ইজমা। সাহাবীদের ইজমা (সর্বসম্মত ঐকমত্য) তাদের পৃথক পৃথক মতামতের চেয়ে শক্তিশালী। অতঃপর তাবেয়ী, অতঃপর তবে তাবেয়ীন। অর্থাৎ তিন যুগ তথা সাহাবা, তাবেয়ীন এবং তাবে-তাবেয়ীন। সর্বশেষ উৎস হলো, ক্বিয়াস। যদি তুমি কোনো বিধান পূর্বোক্ত তিনটি বিষয় তথা, কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবীদের আমল, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের আমলের মাঝে না পাও তবে, তুমি ক্বিয়াস ব্যবহার করতে পারো।"

(ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/)

ডা. জাকির নায়েকের এ বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি কখনও এ কথা বলতে পারবেন না যে, ইসলামের বিধিবিধান শুধু "কুরআন" ও "সহীহ" হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং ডা. জাকির নায়েকের পক্ষে কখনও এটি বলা সম্ভব নয় যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই, এজন্য এটি একটি ভুল ধারণা। কেননা

কোনো একটি বিষয় কুরআন ও সহীহ হাদীসে না থাকলেই যে সেটি 'ভুল ধারণা' হবে এ কথা বলা মূলত শরীয়তকেই অস্বীকার করার নামান্তর। আল্লাহ আমাদেরকে যে শরীয়ত দিয়েছেন, এটি শুধু "কুরআন ও "সহীহ" হাদীসে সীমাবদ্ধ নয়। "সহীহ" হাদীস ব্যতীত হাসান লিজাতিহি, হাসান লিগাইরিহি, যয়ীফ হাদীসও যেমন রাসূল (সা.)-এর হাদীস, তেমনি ইজমা, ক্বিয়াসও শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ। অতএব ডা. জাকির নায়েক এখানে নিজেই নিজের বিরোধিতা করে একটি বিষয়কে "ভুল ধারণা" বলেছেন।

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের বক্তব্য উপস্থাপন করেছি, যেখানে যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের সকলেই উল্লেখ করেছেন যে, চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহের মাঝে ইজমা সংগঠিত হয়েছে। আর ইজমা শরীয়তের চার দলিলের একটি, যা ডা. জাকির নায়েক নিজেও স্বীকার করেছেন।

এর পরও ডা. জাকির নায়েক যদি বলেন, আমি উলামায়ে কেরামের এ ইজমা মানি না। আমাকে শুধু "কুরআন ও সহীহ" হাদীস থেকে প্রমাণ দেখাতে হবে। তবে আমরা বলব, কারও জন্য দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা কখনও বৈধ ও বাস্তবসম্মত হতে পারে না। কেননা একদিকে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ইজমা শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ, অন্যদিকে তিনি বলছেন, কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই এজন্য এটি একটি ভুল ধারণা।

এটি সর্বজনবিদিত যে, রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর প্রায় এক লক্ষ থেকে সোয়া লক্ষ সাহাবী বর্তমান ছিলেন। রাসূলের ইন্তেকালের পর সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিজয়ের ধারা অব্যাহত ছিল এবং লক্ষ লক্ষ লোক মুসলমান হয়েছে। মূল প্রশ্নটি হলো, এক লক্ষ থেকে সোয়া লক্ষ সাহাবীর মধ্যে কয়জন সাহাবী ফাতাওয়া প্রদান করতেন এবং শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে সমাধান পেশ করতেন?

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) লিখেছেন,

والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفسا ما بين رجل وامرأة وكان المكثرون منهم سبعة :عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين و زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر.

রাসূলের (সা.) সাহাবীদের মধ্যে যাদের ফাতাওয়া সংরক্ষণ করা হয়েছে তাদের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় একশ ত্রিশজন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফাতাওয়া প্রদান করতেন সাতজন–

১. উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)
২. আলী ইবনে আবী তালেব (রা.)
৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)
৪. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.)
৫. যায়দ ইবনে সাবেত (রা.)
৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)
৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)

একশ ত্রিশজন সাহাবীর মধ্যে যাদের ফাতাওয়ার সংখ্যা খুব বেশি নয় আবার খুব কমও নয়, অর্থাৎ যাদের ফাতাওয়ার সংখ্যা মাধ্যমিক স্তরের, তাদের সংখ্যা হলো তেরজন।

(ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন আন রাব্বিল আলামিন, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২)

এ বিশজন ব্যতীত একশ ত্রিশজন সাহাবীর অবশিষ্ট সকলেই যে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন, তার সংখ্যা খুবই কম।

এখানে বিবেচনার বিষয় হলো, কোথায় সোয়া লক্ষ আর কোথায় একশ-দু'শ সাহাবী! অবশিষ্ট সাহাবীরা তাহলে কী করেছেন? স্পষ্টত অন্য সাহাবীরা ফাতাওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সাহাবী অভিজ্ঞ ছিলেন, তাদের অনুসরণ করেছেন।

"আল্লামা ইবনে সিরীন (রহ.) দোয়া করতেন,

"اللهم أبقنى ما أبقيت ابن عمر اقتدى به ابن عباس"

"হে আল্লাহ! আপনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে যত দিন জীবিত রাখেন, তত দিন আমাকেও জীবিত রাখুন! যেই আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের অনুসরণ করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)" (প্রাগুক্ত)

এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের অনুসরণ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন, রইসুল মুফাসসিরীন (মুফাসসিরগণের সরদার)। রাসূল (সা.) তাঁর জন্য দু'আ করেছেন, "আল্লাহুম্মা আল্লিমহুল কিতাব" (হে আল্লাহ তাঁকে কুরআনের ইলম দান করুন)। এত বড় বিদ্বান ব্যক্তি, অথচ তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর অনুসরণ করেছেন। ডা. জাকির নায়েক এ ক্ষেত্রে কী বলবেন? ডা. জাকির নায়েক কি এ ক্ষেত্রে বলবেন যে, যেহেতু এ বিষয়টি কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই এজন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের অনুসরণ

الحلال والحرام، لو لم تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين : لأدى ذلك إلى فساد الدين، وأن يعد كل أحمق متكلف طلبت الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين؛ فربما كان بتحريف يحرفه عليهم كما وقع ذلك كثيراً من بعض الظاهرين، وربما كانت تلك المقالة زلة من بعض من سلف قد اجتمع على تركها جماعة من المسلمين .فلا تقضى المصلحة غير ما قدره الله وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين -رضى الله عنهم - أجمعين.

অর্থাৎ তাকে উত্তর দেয়া হবে যে, যেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মানুষকে কুরআন শরীফের সাত ক্বিরাত থেকে এক ক্বিরাত পাঠের ওপর বাধ্য করেছিলেন, কারণ যখন তারা দেখলেন যে, এরই মাঝে মুসলমানদের পূর্ণ সফলতা নিহিত আছে এবং মুসলমানদেরকে যদি বিভিন্ন ক্বিরাতে কুরআন পাঠের অনুমতি দেয়া হয়, তবে তারা মহা ধ্বংসের মুখে নিপতিত হবে, তেমনিভাবে শরীয়তের মাসআলা-মাসাইল ও হালাল-হারামসংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে যদি সুনির্দিষ্ট কিছু উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের ওপর মানুষকে একত্র করা না হয়, তবে সেটি দ্বীনের ধ্বংস বয়ে আনবে। নিরেট নির্বোধ-মূর্খরাও নিজেদেরকে বড় বড় মুজতাহিদ ইমামের আসনে সমাসীন করবে এবং নিজের মনগড়া বক্তব্যকে পূর্ববর্তীদের কিছু পরিত্যাজ্য বক্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত করে করাটাও বৈধ নয়?

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ইলম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাবেয়ী হযরত মাইমুন ইবনে মিহরান বলেছেন!

ما رأيت أفقه من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس"

"আমি হযরত ইবনে উমরের চেয়ে অধিক ফকীহ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখেনি।"

[ই'লামুল মুওয়াক্বিয়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এত বড় ফযিলত ও পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি কি স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দাবি করেছেন?

হযরত ইবনে জারীর (রহ.) বলেন,

"وقد قيل إن ابن عمر وجماعة ممن عاش بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا."

বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এবং রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে পরবর্তীতে যারা মদীনায় বসবাস করতেন, তাদের অনেকেই হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা.)-এর 'মাযহাব' অনুযায়ী ফাতাওয়া দিতেন। তারা হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা.)-এর নিকট থেকে সেসব বিষয় গ্রহণ করতেন, যেগুলোর ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর সংরক্ষিত কোনো হাদীস পেতেন না"

[ই'লামুল মুয়াক্বিয়ীন, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১]

এখানে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবনে উমর (রা.) ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য হযরত ইবনে আববাস (রা.) তাঁকে অনুসরণ করেছেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে হযরত ইবনে উমর (রা.) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন। সুতরাং রাসূল (সা.)-এর সাহাবীদের মাঝে যারা অভিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তারাই ফাতাওয়া প্রদান করতেন এবং অন্যরা তাদের অনুসরণ করতেন।

একইভাবে মুসলিম উম্মাহ ফিকহ শাস্ত্রে চার ইমামের অনুসরণের ব্যাপারে একমত হয়েছে। কেননা ফিকহ শাস্ত্রে চার ইমামের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতের বিষয়ে সকলে একমত।

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.)-এর উক্তি :

চার মাযহাবের ওপর ডা. জাকির নায়েক যে অভিযোগ করেছেন, এ ধরনের অভিযোগ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) লিখেছেন-

فإن قال أحمق متكلف :كيف يحصر الناس فى أقوال علماء متعينين و يمنع من الإجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين؟

অর্থাৎ যদি কোনো নির্বোধ প্রশ্ন করে যে, কেন মানুষকে সুনির্দিষ্ট কিছু আলেমের বক্তব্যের ওপর সীমাবদ্ধ করা হবে এবং আমাদেরকে "ইজতেহাদ" থেকে বাঁধা প্রদান করা হবে অথবা আমাদেরকে চার ইমাম ব্যতীত অন্য ইমামদের অনুসরণ করতে দেয়া হবে না কেন?

قيل له :كما جمع الصحابة رضى الله عنهم الناس من القراءة بغيره من القرآن؛ لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك، و أن الناس إذا تركوا يقرؤون بحروف شتى و قعوا فى أعظم المهالك

فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى

দ্বীনের বিকৃতির পথে অগ্রসর হবে। যেমন কোনো কোনো যাহেরী আলেম করেছেন। অথচ সে সমস্ত মাসআলায় পূর্ববর্তীদের অনুসরণ না করার ব্যাপারে উম্মত একমত হয়েছে।

(উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আল্লামা ইবনে হাযাম যাহেরী, দাউদে যাহেরী। ইবনে হাযাম যাহেরী (রহ.) গানবাদ্যকে বৈধ বলতেন। এ ধরনের অসংখ্য মাসআলা তারা দিয়েছেন যেগুলো কোনোভাবেই আমলযোগ্য নয়।)

সুতরাং মুসলিম উম্মাহের কল্যাণ আল্লাহর ফয়সালাকৃত এ চার মাযহাবের অনুসরণের মাঝেই নিহিত আছে"

[আর-রাদ্দু আলা মান ইত্তাবা গাইরাল মাযাহিবিল আরবায়া, পৃষ্ঠা-১০]

চার মাযহাবের কোনো একটিকে অনুসরণ করতে বাধ্য করার মূল কারণ হলো, ইসলামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা। কেননা যদি প্রত্যেককেই নিজের মতানুযায়ী মাসআলা প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়, তবে প্রত্যেকেই নিজের সুবিধা অনুযায়ী মাসআলা তৈরি করবে। আর এভাবে ইসলামের মূল অস্তিত্বকেই ধ্বংস করে ফেলবে।

যেমন ধরুন! ডা. জাকির নায়েকের প্রয়োজন হয়েছে, তিনি টিভি চ্যানেলের জন্য যাকাত নেয়াকে বৈধ করেছেন। এবং তিনি এমন অনেক মাসআলা দিয়েছেন, যা কোনোভাবেই আমলযোগ্য নয়। আরেকজন ব্যবসায়ী তার প্রয়োজন অনুযায়ী সুদকে হালাল করার চেষ্টা করবে। কোনো মিউজিশিয়ান চেষ্টা করবে, তার প্রয়োজন অনুযায়ী কিভাবে গানবাদ্যকে হালাল করা যায়। নেশাখোর চেষ্টা করবে, কিভাবে কুরআন ও হাদীসকে তার অনুগামী বানিয়ে নেশাজাতীয় দ্রব্য হালাল করা যায়। এভাবে ইসলাম আর ইসলাম থাকবে না। ইসলাম তখন স্বেচ্ছাচারীদের খেলনায় পরিণত হবে। ইচ্ছা হলে তা নিয়ে খেলবে, আবার মন চাইলে ছুড়ে ফেলবে।

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী সাহেব (দাঃ বাঃ) লিখেছেন,

"যদি দলিল প্রমাণকে চিন্তা ও গবেষণার অনুগামী বানিয়ে কর্মপন্থা নিরূপণ করা হয়, তাহলে কুরআনে কারীম দ্বারাই খ্রিস্টধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হবে। তেমনিভাবে ইহুদীবাদ, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ কোনোটিই আর অপ্রমাণিত থাকবে না। অবশেষে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে, পারভেজ সাহেব তার গ্রন্থ 'ইবলিস ও আদম'-এর মধ্যে ডারউইনের মতবাদকেও কুরআনের দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এ পদ্ধতি অনুসরণ করেই গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দামেস্ক দ্বারা কাদিয়ান উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর যে হাদীসে আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) 'বাবে লুদ' নামক স্থানে দাজ্জালকে হত্যা করবে, সেখান থেকে দলিল নিয়ে মির্জা কাদিয়ানী ঈসা (আ.) হওয়ার দাবি করে বলেছেন, এখানে 'লুদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'লুদিয়ানা' আর এর দরজা হচ্ছে কাদিয়ান।"

(আসরে হাযের মে ইসলাম কেইসে নাফেয হো, আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী, (অনুবাদ, আধুনিক যুগে ইসলাম, পৃষ্ঠা-১৪২)

সুতরাং প্রবৃত্তি পূজারী, স্বেচ্ছাচারী, সুবিধাভোগীদের বিকৃতির হাত থেকে ইসলামকে রক্ষার জন্যই উলামায়ে কেরাম চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ঘটনা :

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) "মুসাওয়াদা" নামক কিতাবে এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) "ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন" নামক কিতাবে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই-

"একদা এক ব্যক্তি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করল, কেউ যদি এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে, তবে সে কি ফকীহ হতে পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। লোকটি আবার প্রশ্ন করল, যদি দুই লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে? ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বললেন, না। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, যদি সে তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে? তিনি বললেন, না। লোকটি আবার প্রশ্ন করল, কেউ যদি চার লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে, তবে কি সে ফকীহ হতে পারবে? অতঃপর তিনি হাত নাড়ালেন। অর্থাৎ এখন হয়ত সে ফকীহ হতে পারবে।

অতঃপর আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) ইবনে শাকেলা (রহ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন,

তিনি বলেন,

"একদা আমি জামে মানসুরে ফাতাওয়া দেয়ার জন্য বসেছিলাম এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, "তুমি নিজেই তো এ পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করোনি, অথচ তুমি ফাতাওয়া দিচ্ছো?

আমি তাকে বললাম, আল্লাহ পাক তোমাকে মাফ করুন! যদিও আমি নিজে এ পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করিনি, কিন্তু যে এ পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করেছে, তার কথা অনুযায়ী ফাতাওয়া দিচ্ছি। তিনি এ

পরিমাণ বা এর চেয়ে বেশি হাদীস মুখস্থ করেছেন।"

অর্থাৎ তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর কথা অনুযায়ী ফাতাওয়া দিচ্ছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মুসনাদে আহমাদ রচনা করেছেন।

(আল-মুসাওয়াদা, পৃষ্ঠা-৫১৬, ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫)

এ ঘটনা থেকে কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারবে না যে, ফিকহ শাস্ত্রে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের অনুসরণ ব্যতীত বর্তমান যুগে কারও জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণ মুজতাহিদ হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু আমরা এমন একটি সময়ে এসে উপনীত হয়েছি, যে সম্পর্কে মালেক বিন নবী (রহ.)-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য- তিনি বলেন,

والحقيقة أنَّنا قبل خمسين عاماً كنَّا نعرف مرضاً واحداً يمكن علاجه ، هو الجهل والأميَّة ، ولكننا اليوم أصبحنا نرى مرضاً جديداً مستعصياً هو(التعالم .(وإن شئت فقل :الحرفيَّة فى التعلُّم ؛ والصعوبة كلَّ الصعوبة فى مداواته

"আমরা পঞ্চাশ বছর পূর্বে একটি রোগ সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যার প্রতিকার করাও সম্ভব ছিল; সেটি হলো, অজ্ঞতা ও মূর্খতা। কিন্তু বর্তমানে আমরা এক নতুন দূরারোগ্য ব্যধির মুখোমুখি হয়েছি, সেটি হলো, স্বশিক্ষিত হওয়ার প্রবণতা, যাকে পেশাদার শিক্ষাও বলা যেতে পারে। এ ধরনের ব্যধির প্রতিবিধান অসম্ভব। (শুরুতুন নাহজা, পৃষ্ঠা-৯১)

জাকির নায়েক একজন প্রফেশনাল ডাক্তার। তিনি নিজেও জানেন, কারও মায়ের যদি হার্টে কোনো সমস্যা থাকে, তবে সে কার নিকট যাবে। এ প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েক বলেছেন-

For example : your mother has the heart problem, what will you do, who will go to? You won't go to Tom, Dick and Harry. You will go to a heart specialist, you do research. MBBS? No-no-no. MD? MD in what? MD in brain? No-no-no. In heart? Yes. Before going to a doctor you do research. You check up what is his degree. MBBS? No-no-no. MD? Ha, Yes! MD in what? Gynaecology? No-no-no. Kidney? No-no-no. Brain? No-no-no. Cardiology? Ha, yes! DM, super speciality . . .

"যদি তোমার মায়ের হার্টে কোনো সমস্যা থাকে, তবে তুমি কী করবে? কার নিকট যাবে? তুমি টম, ডিক ও হ্যারি যে কারও নিকট যেতে পারো না। তোমাকে একজন হার্ট স্পেশালিস্টের নিকট যেতে হবে। তোমাকে গবেষণা করতে হবে। তোমাকে চেক করে দেখতে হবে, তার ডিগ্রি কী। এমবিবিএস? না-না-না। এমডি? ইয়েস! কিসে এমডি? গাইনাকলোজি? না-না-না। এমডি ইন ব্রেইন? না-না-না। কার্ডিওলজি? হ্যাঁ, ইয়েস! ডিএম সুপার স্পেশালিস্ট . . .

(ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/)

ইসলামিক জুরিস প্রুডেন্স তথা ফিকহ শাস্ত্রে সুপার স্পেশালিস্ট কারা?

মুসলিম উম্মাহের সকলেই একমত যে, ফিকহ শাস্ত্রে চার ইমাম হলেন, সুপার স্পেশালিস্ট।

কেউ যদি কোনো ডাক্তার সুপার স্পেশালিস্ট এবং কোনো ডাক্তার গ্রামীণ- হাতুড়ে, সেটা পার্থক্য করতে না পারে, তবে তার জন্য উচিত হলো, যারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদের শরণাপন্ন হওয়া। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে চুপ থাকা। কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তারকে সুপার-স্পেশালিস্ট এবং সুপার স্পেশালিস্টকে হাতুড়ে মনে করাটা মহা অন্যায়।

এ সম্পর্কে বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাজালী (রহ.) বলেছেন-

لو سكت من لا يعرف قلَّ الاختلاف ، ومن قصر باعه وضاق نظره عن كلام علماء الأمَّة والاطِّلاع عليه فماله وللتكلُّم فيما لا يدريه ، والدخول فيما لا يعنيه ، وحق مثل هذا أن يلزم السكوت

"অজ্ঞ লোকেরা যদি চুপ থাকত, তবে মতানৈক্য কমে যেত। মুসলিম উম্মাহের উলামায়ে কেরামের বক্তব্য বুঝতে এবং তার মর্ম উপলব্ধি করতে যার হাত খাটো, যার দৃষ্টি সংকীর্ণ, সে ব্যক্তি এবং যে না জেনে কথা বলে, আর যে অনর্থক বিষয়ে মাথা ঘামায়, এদের মাঝে কী পার্থক্য রয়েছে? (অর্থাৎ এদের কারও জন্য এ ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়, বরং) এদের জন্য আবশ্যক হলো, এরা যেন চুপ থাকে"

[আল-হাওয়ী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৬]

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : হজ্ব

মুহা : হারুনুর রশিদ
মণিপুর, মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা-১

হজ্বের সময় মিনায় অবস্থানকালে মিনার তাঁবুতে যোহর, আসর ও ইশার নামায কসর পড়তে হবে কি না?

জিজ্ঞাসা-২

আরাফার দিন মসজিদে নামীরায় যাওয়া সম্ভব না হলে আরাফায় তাঁবুতে যোহর ও আসরের নামায একসঙ্গে পড়বে, না কি যোহরের সময় যোহর ও আসরের সময় আসর নামায পড়বে এবং আরাফাতে যোহর ও আসর কসর হবে কি না?

সমাধান-১

নামায কসর করার বিধানটি মুসাফিরের জন্য প্রযোজ্য। মিনায় অবস্থানকালে মুসাফির হলে কসর পড়বে অন্যথায় পূর্ণ নামায আদায় করবে।

সমাধান-২

মসজিদে নামীরায় ইমামের পেছনে নামায পড়া সম্ভব না হলে আরাফার তাঁবুতে যোহর এবং আসর একসাথে পড়া যাবে না। বরং নিজ নিজ ওয়াক্তে পড়তে হবে। মুসাফির হলে কসর পড়বে অন্যথায় নয়। আর মুকীম ইমামের পেছনে সর্বাবস্থায় পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৫০৪)

প্রসঙ্গ : দাফন স্থানান্তর

মাসুম বিল্লাহ
সাভার, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

মৃত ব্যক্তিকে দাফনের জন্য এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যাওয়ার শরয়ী বিধান কী? বিস্তারিত জানাবেন।

সমাধান :

বিনা উজরে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার জন্য এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ। (শামী ১/৪৪৩, তাহতাবী ৩৩৭)

প্রসঙ্গ : মীরাছ

মুহা : বদিউর রহমান
চাঁপাই, রাজশাহী।

জিজ্ঞাসা :

আমরা ৫ ভাই, ৩ বোন। আমার মেজ ভাই নজরুল তার ১ মেয়ে ও স্ত্রী রেখে মারা যান, তারপর আমাদের পিতা মারা যান, মাতা এখনও জীবিত। আমার জানার বিষয় হলো, মরহুম ভাইয়ের ওই মেয়ে আমাদের পিতা তথা তার দাদার সম্পদে কী পরিমাণ অংশ পাবে?

সমাধান :

শরীয়তে মুহাম্মদী (সা.)-এর বিধান অনুযায়ী মরহুম নজরুলের মেয়ে তার দাদার সম্পদে কোনো অংশ পাবে না, তবে দাদা যদি স্বেচ্ছায় তাকে কিছু দান করে যায়, অথবা চাচারা নিজেদের সম্পদ থেকে দান করে শুধুমাত্র তা পাবে। উল্লেখ্য, মরহুম নজরুলের নিজ অর্জিত কোনো সম্পদ থাকলে তার অর্ধাংশ তার মেয়ে পাবে। (সহীহুল বুখারী ২/৯৯৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/৫২৩)

প্রসঙ্গ : ব্যবসা

মুহাম্মদ ইবরাহীম
বনানী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

মানুষের ওজন ও উচ্চতা নির্ণয় করে টাকা নেওয়া বৈধ আছে কি না?

সমাধান :

মানুষের ওজন ও উচ্চতা নির্ণয় করে টাকা গ্রহণ করা বৈধ। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৫১৩)

প্রসঙ্গ : পর্দা

হাফেজ রিদওয়ান
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

মহিলাগণ কোনো তালীমের মজলিসে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মাহরাম ছাড়া নিজ মহল্লা বা আশপাশের মহল্লায় যেতে পারবে কি না? পারলে কত দূর পর্যন্ত যেতে পারবে? অনুরূপ চিকিৎসা, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, রোগীর ইয়াদত ও মৃত ব্যক্তির তাযিয়াতের উদ্দেশে মাহরাম ব্যতীত কত দূরে যেতে পারবে?

সমাধান : বর্তমান ফেতনার যুগে মাহরাম ছাড়া নিকটেও যাওয়া অনুচিত। তবে অতি জরুরি দ্বীনি মাসআলা জানা বা চিকিৎসা ও এ ধরনের অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে মাহরাম ছাড়া তত দূর যেতে পারবে, যত দূর তার নিরাপত্তা বিঘ্ন হওয়ার আশংকা না হয়। (জামিউত তিরমিযী ৩/৩৭৬)

প্রসঙ্গ : তারাবীতে খতমে কুরআনের বিনিময় গ্রহণ

আবু বকর

চরফ্যাশন, ভোলা।

জিজ্ঞাসা :

সম্প্রতি তারাবীর নামাযে খতমে কুরআন করার পর হাফেজ সাহেবানদেরকে টাকা-পয়সা-কাপড় ইত্যাদি প্রদান করা হয়। শরীয়তে এর বিধান কী?

সমাধান :

তারাবীতে খতমে কুরআনের বিনিময় হিসেবে কোনো কিছু প্রদান করা টাকা হোক বা অন্য কিছু, শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ। (রদ্দুল মুহতার ৬/৫৫)

প্রসঙ্গ : নামায

হাফেয সাইফুল্লাহ

মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

মা'যুর ইমাম যে চেয়ারে বসে ইশারায় নামাযে রুকু-সেজদা আদায় করে তার পেছনে সুস্থ ব্যক্তিদের ইক্তিদা সহীহ হবে কি না?

সমাধান :

এমন মা'যুর ইমাম যে চেয়ারে বসে ইশারা করে নামায পড়ে তার পেছনে রুকু-সেজদা করে নামায আদায়ে সক্ষম সুস্থ মুসল্লিগণের ইক্তিদা সহীহ নয়। (রদ্দুল মুহতার ১/৫৭৯)

প্রসঙ্গ : শিক্ষা প্রতিযোগিতা

মাও. আমিনুল ইসলাম

জালালপুর মাদরাসা, সুনামগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের জেলায় সুনামগঞ্জ 'উন্নয়ন ফোরাম' নামে একটি সংস্থা আছে, যারা কওমী মাদরাসার মেধাবী ছাত্রদেরকে পুরস্কৃত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর একটি লিখিত পরীক্ষা নেয় এবং এতে অনেক ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ মার্ক যাদের হবে তাদের মধ্যে ১৩ জনকে পুরস্কার দেয়। উল্লেখ্য যে, যারা উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তারা ৩০ টাকা করে ফি দিতে হয়, এখন আমার জানার বিষয় হলো, তাদের উক্ত ফি গ্রহণ করা জায়েয কি না?

সমাধান :

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের কাছ থেকে ফি নেওয়া বৈধ হবে না। (রদ্দুল মুহতার ৬/৪০৩)

প্রসঙ্গ : যাকাত

মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন

আগ্রাবাদ, একসেস রোড, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা : আমাদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তার যাকাতের অংশ এতীমদের জন্য দান করেন। এতীমদের অভিভাবকগণ তা গ্রহণ করে এতীমদের বসবাসের ঘর না থাকাতে তা দিয়ে এবং অন্যান্যদের থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে এতীমদের জন্য ঘর নির্মাণ করে দিতে চাইছেন। এমতাবস্থায় একজন বললেন, দাতা ব্যক্তির যাকাত আদায় নাও হতে পারে। অতএব আপনাদের সমীপে জানতে চাই উক্ত দাতা ব্যক্তির যাকাত আদায় হলো কি না?

সমাধান :

যাকাত খাওয়ার উপযোগী এতীমদের অভিভাবকগণ তাদের পক্ষ থেকে যাকাতের টাকা গ্রহণ করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। নির্মাণ করে দিলে এতে যাকাত আদায় হওয়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের সংশয় নেই। (তুহফাতুল ফুকাহা ১/৩০৭, ফতাওয়ায়ে কাজী খাঁ ১/১৯০)

প্রসঙ্গ : তারাবীহ

হাফেজ মুহাম্মদ সফীউল্লাহ

মাতারবাড়ী, মহেশখালী, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

তারাবীর নামাযে প্রত্যেক চার রাকআত পর নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া হয়। এবং এটিকে অনেকে জরুরি মনে করে। سبحان ذى الملك والملكوت الخ শরীয়তে এটি পড়ার বিধান কী?

সমাধান :

তারাবীর নামাযে প্রতি চার রাকআত পর কিছুক্ষণ বসা, আরাম করা মুস্তাহব। ওই সময় তাসবীহ, তেলাওয়াত অথবা চুপ থাকার ইখতিয়ার রয়েছে। কারো কারো নিকট ওই সময় একাকী নামায পড়ারও অনুমতি আছে। মোট কথা, এ সময়ের জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কোনো আমল নেই। প্রশ্নে বর্ণিত দু'আটি খুবই উত্তম একটি দু'আ। এটি পড়া জায়েয আছে। তবে এটিকে জরুরি মনে করার কোনো অবকাশ নেই এবং এটি না পড়লে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে বা গোনাহ হবে মনে করা মারাত্মক ভুল। (শামী ২/৪৬)

প্রসঙ্গ : আলেমকে গালি দেওয়ার হুকুম

নূর মুহাম্মদ

আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

এক আলেম চোর ধরেছে এবং চোর নিজে স্বীকারও করেছে। এ কারণে ওই আলেম চোরকে একটি থাপ্পর দিয়ে নিয়ে আসে। চোরের বাবা এবং ভাই ওই আলেমকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করেছে এবং হুজুরের দাড়ি ধরে আঘাত করেছে। ইসলামী আইন অনুসারে তার বিবি তালাক্ব হবে কি? যদি না হয় ইসলামী আইন অনুসারে কী বিচার করা যায়। সঠিক উত্তর দিলে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধান :

ফিক্বাহ বিষারদগণের মতে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো আলেমে দ্বীনকে এলমে দ্বীন শিক্ষার কারণে অথবা শরীয়তে মুহাম্মদী

(সা.)-কে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে গালমন্দ করে থাকে তখন সে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে বিবাহিত হলে বিবাহ পুনরায় পড়িয়ে নিতে হবে। আর যদি দুনিয়াবী কোনো কারণে উক্ত আচরণ করে থাকে তখনও গুনার কাজ করেছে, তাই আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে আর উক্ত আলেম হতে মাফ চাইতে হবে। (শামী ৩/৩১৬, ফতাওয়ায়ে দারুল উলূম ১/২৫৫)

প্রসঙ্গ : কতটুকু ইলম শিক্ষা করা ফরজ

মুকাদ্দিস আলী
মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

কতটুকু ইলম শিখা ফরজ? ফরজ আদায় হয় এ ধরনের কোনো স্বতন্ত্র পুস্তক আছে?

সমাধান :

মুসলমানের জন্য ততটুকু এলেম শিখা জরুরি যদ্ধারা ছহীহ আকায়েদ, ইবাদত, মু'আমালাত এবং শরীয়তের আদেশ-নিষেধগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে পারে। মোটামুটি শরীয়তের জরুরি বিষয়গুলো জানার জন্য "বেহেস্তী জেওর" কিতাবখানা কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমের কাছে পড়তে পারলে একজন সাধারণ লোকের যথেষ্ট হবে বলে আমরা মনে করি। (ফতহুল বারী ১/১৭০)

প্রসঙ্গ : পরপুরুষকে হেফজ শোনানো

আহমদ হুসাইন
মিরপুর-১০, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

১৫ বছর বয়স্কা একটি বালিকা, হাফেজা মহিলার কাছে ১৪ পারা হেফজ করেছে। কোনো কারণে ওই (ওস্তাদ) হাফেজা মহিলা আর পড়ান না এবং অন্য হাফেজার কোনো ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। অভিভাবক বালিকাটির বাকি ১৬ পারা হেফজ করানোর জন্য একজন (বিবাহিত) পুরুষ হাফেজ সাহেবের ব্যবস্থা করল। যাতে পর্দার সাথে বালিকাটি বাকি পারাগুলো ইয়াদ করে ফেলে এবং হাফেজা হয়ে যায়। (উপরোক্ত ব্যাপারে বাহিরের পুরুষ লোকের জন্য বালেগা মেয়ের আওয়াজ শোনা শরীয়তে কতটুকু অনুমতি দেয়?

সমাধান :

মহিলাদের বুঝ বুদ্ধি হওয়ার পর কোনো বেগানা পুরুষের নিকট পর্দার সহিত ও শিক্ষা লাভ করা জায়েয নয়। ঘরের বাইরে ও ভেতরে একই কথা। তদুপরি প্রশ্নে বর্ণিত বালিকা হেফজ শেষ করা কোনো জরুরি বিষয় নয়। বৈধ পন্থায় পারলে ভালো না হয় মাথাব্যথার প্রয়োজন নেই। (শামী ১/৪০৬, এমদাদুল মুফতীন ২/১০৩১)

প্রসঙ্গ : কদমবুচি

মুহাম্মদ শিব্বীর
কাওয়ারকূপ, রামু, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমানে প্রচলিত কদমবুচি সম্পর্কে শরীয়তের ফায়সালা কী? এবং কোনো পুরুষ বা নারী একে অপরকে কদমবুচি করা চাই তারা উভয়ে মাহরাম হোক বা না হোক। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা দলিল-প্রমাণসহ জানতে আগ্রহী।

সমাধান :

সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রচলিত কদমবুচি করা কোরআন শরীফে এবং হাদীস শরীফের কোনো বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই এর থেকে বিরত থাকা উচিত। কোনো কোনো আলেম এটিকে মাকরুহে তাহরীমি বলেছেন। মহিলাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। (এমদাদুল ফতাওয়া ৪/২৭৯, ফতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১৫/৩৫৩)

প্রসঙ্গ : জানাযার পর দাঁড়িয়ে দু'আ

মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন
বৈলছড়ি, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী জানাযার পর সেই স্থানে দাঁড়িয়ে পুনরায় দু'আ করা হয় এবং কখনো কখনো করার জন্য জোর জবরদস্তি করা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী?

সমাধান :

জানাযার নামাযকে নামায বলা হলেও বাস্তব পক্ষে তা মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আই। তাই সালামের পর দু'আ করা পুনরায় জানাযার নামাযের মতো হয়ে যায়। এজন্য ফিক্বহবিদগণ সালামের পর পুনরায় দু'আ করাকে নিষেধ করেছেন। উপরন্ত শরীয়তে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। (শামী ২/২১০, মেরকাত ৪/৬৪, আহসানুল ফতাওয়া ১/৩৩৬

খানেকাহে এমদাদিয়া
আশরাফিয়া আবরারিয়ার

বার্ষিক ইসলাহী ইজতিমা

২৫,২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ইং
২ ,৩ রবিউল আওয়াল ১৪৩৬ হি.

বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান: জামে মসজিদ, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

ইসলামে মানবাধিকার-৫

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

প্রত্যেকের আরজি শোনার অধিকার :

দুনিয়ায় ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ততক্ষণ সম্ভব হবে না, যতক্ষণ প্রত্যেক ব্যক্তি তার আরজি শোনানোর অধিকার না পাবে। যেহেতু ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সেহেতু ইসলাম সমাজের প্রত্যেক লোকের আরজি শোনার অধিকার যথাযথভাবেই দিয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এই অধিকারটি চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং নিজেই এটির শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করার জন্য। অভিশপ্ত ইবলিস তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে সিজদা করেনি। আল্লাহ তা'আলা ইবলিসের এমন অহংকারের সাজা দেওয়ার পূর্বে তাকে নিজের আর্জি ও অভিযোগের ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে –

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (١٣) (اعراف)

আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরি করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সিজদা করো, তখন সবাই সিজদা করেছে কিন্তু ইবলিস সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সিজদা করতে বারণ করল? সে বলল, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। বললেন, তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোনো অধিকার তোর নেই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভূক্ত। (আ'রাফ ১১, ১২, ১৩)

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার একটি অংশ তথা হুদহুদ যখন না জানিয়ে নিজের বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে উদাও হয়ে গিয়েছিল তখন হযরত সুলাইমান (আ.) বললেন, সে যদি অনুপস্থিতির যৌক্তিক কোনো কারণ উপস্থাপন করতে না পারে তবে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। এখানে হযরত সুলাইমান (আ.) হুদহুদকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তার বক্তব্য শোনার অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে :

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (٢٠) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢١)

সুলায়মান পখিদের খোঁজখবর নিলেন, অতঃপর বললেন, কী হলো, হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। (নামাল ২০, ২১)

এই অধিকারের সাথে প্রত্যেকের বক্তব্য পেশ করার অধিকারও এসে যায়। অর্থাৎ প্রকৃত ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সকলকে নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে।

পবিত্র কুরআন মজীদে এসেছে –

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ করো তখন মীমাংসা করো ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদেরকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (নিসা ৫৮)

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন –

اذا جلس اليك خصمان فلا تكلم حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول

যদি তোমার কাছে দুটি পক্ষ কোনো বিষয়ে ফায়সালা চইতে আসে তবে প্রথম পক্ষের কথা যেভাবে শুনেছ, সেরূপ দ্বিতীয় পক্ষের কথা শোনা ছাড়া কোনো ফায়সালা দিয়ো না। (বায়হাকী সুনানে কুবরা ১০/১৩৭, তুহফাতুল ফুকাহা ৩/৩৭২)

অন্যের দোষে নিজে দোষী না হওয়ার অধিকার :

ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের মৌলিক একটি বিষয় হলো প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের কর্মের জন্য দায়িত্বশীল বানানো। ইসলাম ন্যায়বিচারের হৃদয়তুল্য এই ধারার আলোকে মানুষকে অন্যের দোষ থেকে নিজের পবিত্রতা প্রকাশের পূর্ণ অধিকার দান করেছে। ইসলামের কথা হলো প্রত্যেকে নিজের আমলের জিম্মাদার। দুনিয়া-আখেরাত কোথাও অন্যের আমলের জন্য জবাবদিহিতার কথা বলা হয়নি। কুরআন মজীদে এসেছে–

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

তারা ছিল এক সম্প্রদায়, যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্য। তারা কী করত সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না। (বাকারা ১৩৫)

مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

যে কেউ সৎ পথে চলে তারা নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্য পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোনো রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না। (বনী ইসরাঈল ১৫)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

তানযীমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়া আল-ক্বওমীয়া বাংলাদেশ এর
কেন্দ্রীয় পরীার ফলাফল প্রকাশ-১৪৩৫হিঃ/২০১৪ইং

প্রেসবিজ্ঞপ্তি : তানযীমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়া আল-ক্বওমীয়া (ক্বওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড) বাংলাদেশ এর অধীনে অনুষ্ঠিত ২০তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল ১৮/০৯/১৪৩৫হিঃ মোতাবেক ১৭/০৭/২০১৪ইং রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.৩০ ঘটিকায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির উপস্থিতিতে বোর্ডের কেন্দ্রীয় দফতর, জামিয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়ায় তানযীমের নব নির্মিত ভবনে প্রকাশিত হয়। এ বৎসর বিভিন্ন স্তরে সর্ব মোট প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র কেন্দ্রীয় পরীায় অংশ গ্রহণ করে। বিভিন্ন জামায়াতের মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত ছাত্রদের আংশিক তালিকা (১ম, ২য় ও ৩য়) নিম্নে উল্লেখ করা হল।

☆ দাওরায়ে হাদীস ঃ সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করেছে মোঃ মাহমুদুল হাসান, প্রাপ্ত নম্বর ৯৭৫, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। ২য় মোঃ মাহদী বিল্লাহ, প্রাপ্ত নম্বর ৯৫৪, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। ৩য় মোঃ মাহমুদুল হাসান, প্রাপ্ত নম্বর ৯২৩, জামেয়া আরাবিয়া শামছুল উলুম কারবালা মাদরাসা, বগুড়া। ।

☆ মিশকাত জামাত ঃ ১ম মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রাপ্ত নম্বর ৬৬৬, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। ২য় মোঃ মিসবাহুল হক, প্রাপ্ত নম্বর ৬৫১, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া আল্লামা মুহাম্মাদ মিয়া কাসেমী মাদরাসা, রাজশাহী। ৩য় মোঃ রুহুল আমিন, প্রাপ্ত নম্বর ৬৩৮, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া।

☆ চাহারম জামাত ঃ ১ম মোঃ শফিউল আলম, প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৪, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। ২য় মোঃ ওমর ফারুক, প্রাপ্ত নম্বর ৬৬৭, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। ৩য় মোঃ শামছুল হক, প্রাপ্ত নম্বর ৬৬২, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া।

☆ শশম জামাত ঃ ১ম মোঃ জুনাইদ আহমদ, প্রাপ্ত নম্বর ৬৮২, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া । ২য় মোঃ ওমর ফারুক, প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৭, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। ৩য় মোঃ সৈয়দ আলী, প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৩, জামেয়া আরাবিয়া শামছুল উলুম কারবালা মাদরাসা, বগুড়া ।

☆ হাশতম জামাত ঃ ১ম মোঃ আব্দুল্লাহ, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৭, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। ২য় মোঃ একরামুল ইসলাম, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৬, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। ৩য় মোঃ ইশরাক, প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। ৩য় মোঃ আলাউদ্দীন আহমদ, জামেয়া আরাবিয়া শামছুল উলুম কারবালা মাদরাসা, বগুড়া। ৩য় মোঃ যোবায়ের হোসেন, জামিয়া আরাবিয়া নিউ টাউন, দিনাজপুর।

☆ নহম জামাত ঃ ১ম মোঃ মছিহুর রহমান, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৩, জামিয়া হুসাইনিয়া খুকনী, সিরাজগঞ্জ। ২য় মোঃ আল আমিন, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২, জামিয়া হুসাইনিয়া খুকনী, সিরাজগঞ্জ। ৩য় মোঃ সোহানুর রহমান, প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া।

☆ দহম জামাত ঃ ১ম মোঃ মাহমুদুল হাসান, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৩, শাহ কামালিয়া মদিনাতুল উলূম কওমী মাদরাসা, তেলীপুকুর, বগুড়া। ২য় মোঃ আল আমিন, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০, মদিনাতুল উলূম চকসুত্রাপুর মাদরাসা, বগুড়া। ৩য় মোঃ মোত্তালিবুর রহমান, প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯, মাদরাসাতুল উলূমিল ইসলামিয়া রৌহা, সিরাজগঞ্জ।

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ

চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩